কৃষকের বিরুদ্ধে বীজ কোম্পানি

কোম্পানি বীজ ব্যবহার করে প্রতারণার শিকার
কৃষকদের পক্ষে একটি জনএজাহার

PRAN

পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড
অ্যাকশান নেটওয়ার্ক- প্রান

csrl

গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের
জন্য প্রচারাভিযান- সিএসআরএল

কৃষকের বিরুদ্ধে বীজ কোম্পানি

কোম্পানি বীজ ব্যবহার করে প্রতারণার শিকার কৃষকদের পক্ষে একটি জনএজাহার

কৃষকের বিরুদ্ধে বীজ কোম্পানি
কোম্পানি বীজ ব্যবহার করে প্রতারণার শিকার কৃষকদের পক্ষে একটি জনএজহার

প্রকাশক :পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক-প্রান, সম্পাদনা : নুরুল আলম মাসুদ, প্রকাশ : নভেম্বর ২০১১, পৃষ্ঠাসজ্জা : সজীব সৌরভ চন্দ, প্রচ্ছদের ছবি : আজাদুল ইসলাম (দীপ আজাদ)

সহযোগিতায় : গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রচারাভিযান-সিএসআরএল

যোগাযোগ : পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক-প্রান, বাড়ি # ০৮ সড়ক # ৩০, হাউজিং এস্টেট, মাইজদী, নোয়াখালী। ফোন : ০৩২১-৬১৯২০, ০১৯১৯ ২৩১ ৭২২, ইমেইল : info@pran-bd.org ওয়েবসাইট : www.pran-bd.org

পুস্তিকায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলো ইতোমধ্যে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। নিবন্ধগুলোতে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব। পুস্তিকাটি সৃজনী সাধারণ'র আওতায় লাইসেন্সকৃত। অবাণিজ্যিক উদ্যোশে পুস্তিকাটি পুন:মুদ্রণ, আংশিক মুদ্রণ করে ব্যবহার করা যাবে।

কৃষকের মিছিলে .....

'বাঙলাদেশের ৬২ ভাগ মানুষ সরাসরি কৃষি কাজে নিয়োজিত। মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষি ২৩ ভাগ যোগান দেয়। কৃষি থেকেই আমাদের প্রতিদিনের খাবারের ৯৮ ভাগ সরবরাহ আসে। বিদেশি মুদ্রার ১৪ ভাগ আসে এই খাত থেকে। আর 'বীজ'ই এই কৃষিরই কেন্দ্রীয় পুঁজি ও প্রাণ। সেই বীজ আজ দারুনভাবে বিপন্ন। কৃষকের নিজস্ব জ্ঞান-অভিজ্ঞতায় সংরক্ষিত প্রাণবৈচিত্র্যবান্ধব বীজসমূহও আজ নিশ্চিহ্ন।'

প্রতিদিনই দেশের কোথায়ও না কোথায় ফসলহানির খবর আসছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভেজাল বীজের কারণে এসকল বিপর্যয় ঘটছে। উচ্চফলনশীল'তার নামে দেশে বিভিন্ন কোম্পানি নানা ধরণের বীজ বাজারজাত করছে। সরকার প্রতিবছর উৎপাদনের লক্ষমাত্রা ঘোষণা দেওয়ার জন্য যতটা গলা ছেড়ে হাঁক দেয় ঘটনার পরম্পরায় দেখা যাচ্ছে বীজসহ অন্যান্য কৃষি ইনফুট সরবরাহ করা ক্ষেত্রে তার সিঁকি পরিমাণও হাত বাড়ায় না।

'উচ্চফলনশীল বীজ', কখনো 'হাইব্রিড বীজ', কখনো 'জিএম বীজ' নাম দিয়ে চিরায়ত কৃষি জীবনে দখলগিরি করতে নেমেছে গোটাকয় বহুজাতিক কোম্পানি। কৃষকের কাছে এখন আর কোন বীজ নেই; ফলে কৃষককে নির্ভর করতে হচ্ছে বাজারের বীজের ওপর। বীজ নিশ্চয়তার জন্য সরকারের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থাকলেও বীজ নিয়ে কৃষকদের প্রতিনিয়ত অনিশ্চয়তায় পড়ে থাকতে হয়; কৃষকরা বিলাপ করে ক্ষতিপূরণের জন্য, আর্জি করে সহায়তার জন্য। কিন্তু রাষ্ট্র কৃষকের সেই বিলাপ কখনোই কানে তোলে না।

এ বছর বোরো মৌসুমে সারাদেশে ঝলক ধান চাষ করে প্রায় ৩০ হাজার হেক্টর জমির ফসল পুরোপুরি এবং পাঁচ হাজার হেক্টর জমির ফসল আংশিক নষ্ট হয়েছে। হাইব্রিড ঝলক বীজের সমস্যার কারণে একযোগে সারাদেশে ফসল বিপর্যয় ঘটায় ক্ষতিপূরণ দাবি করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুললেও সরকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়ায়নি, বীজ কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা তো দূরের কথা চীন থেকে আমদানীকৃত বীজের সমস্যার কারণেই যে এই বিপর্যয়টি ঘটেছে সেটাই আড়াল করতে চাইছে।

একই সাথে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার হাজারো কৃষক সিনজেনটা বাংলাদেশ লিমিটেডের ভারত থেকে আমদানিকৃত সবল এফ-১ হাইব্রিড টমেটো বীজ কিনে জমিতে লাগানোর পর গাছে কোনো ফল ধরেনি। প্রতারিত কৃষকেরা গোদাগাড়ী কৃষি উন্নয়ন ঐক্য পরিষদের ব্যানারে বীজ-প্রতারণার বিচার ও ক্ষতিপূরণের দাবি তোলেন। কৃষকের

দাবির সঙ্গে স্থানীয় সাংসদ, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী ও নাগরিক সমাজও একাত্ম হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত চার কৃষক সিনজেনটা বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও স্থানীয় পরিবেশকসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। রাজশাহী-১ আসনের সাংসদ বেশ জোরেশোরে সিনজেনটার বীজ-প্রতারণার বিষয়টি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন। কিন্তু তারপরও কৃষকদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কোন আলামত চোখে পড়েনি।

যে দু'টি বীজের কারণে ফলন বিপর্যয় হয়েছে এ দু'টি বীজই বিদেশ থেকে আমদানিকৃত। অথচ ১৯৯৮ সালে সরকার কয়েকটি কোম্পানিকে পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে কোম্পানীগুলো দেশেই হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা করবে এ শর্তে বিদেশ থেকে হাইব্রিড বীজ আমদানির অনুমোদন দেয়। কিন্তু কোম্পানিগুলি নিজেরা বীজ-উৎপাদনের কোনো কার্যকরী উদ্যোগ না নিয়েই অবাধে হাইব্রিড বীজ আমদানি করে চলেছে। সরকার শুধুমাত্র শর্তপূরণ না করার শর্তে কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু সরকার তা করবে না। দেশে বাম্পার ফলন হলে সরকার গলাবাজিয়ে মারহাবা দেয় কিন্তু যদি ফলনহানি হয় তাহলে কোথায় যেন একটা কলুপ এঁটে যায়। এ 'যেন আজন্ম কোনো পাপের ফলে 'কৃষক' নামের একশ্রেণীর জন্ম হয়েছে।' ফসল ফলিয়ে দেশকে বাঁচানোর দায়িত্ব তাঁদের একার, আর সেই ফসল ফলাতে গিয়ে মরা কি বাঁচার দায়দায়িত্বও কৃষকের একার।

এবার বীজ নিয়ে কৃষকদের আন্দোলনগুলো একটু বেশি নজর কেড়েছে অন্য সকলের, কৃষক সমাজ কথা বলছে- বিতর্ক করছে। এটি জাগরণের পথে একটি আলোক ইশারা। এ মিছিলে আরো মানুষের যুথবদ্ধতা প্রয়োজন। এ চিন্তা থেকে ঝলক ধান ও সবল টমেটো বিষয়ক গণমাধ্যমে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে এ সংকলনটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। আমরা বিশ্বাস করি এ প্রকাশনাটি বীজ নিয়ে কৃষকদের আন্দোলনকে যুক্তি-সমর্থন যোগাতে সহায়ক হবে। লেখকদের ধন্যবাদ- এ বিষয়ে লেখার জন্য এবং দৈনিক সমকাল ও দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা- এ দুটি পত্রিকা থেকে আমরা কয়েকটি লেখা নিয়েছি।

'বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে কৃষকের জান ও জমি বাঁচানো ছাড়া আর কোনো গতি আছে কি না, তা এখনো আমরা জানি না'; তাই আশা করি এ সংকলনটি আমাদের আরো সাহস, যুক্তি ও সামর্থ্য বাড়াবে কৃষকের মিছিলে এসে দাঁড়ানোর জন্য।

নুরুল আলম মাসুদ
প্রধান নির্বাহী
পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক- প্রান

সূচি

১
ঝলক ধান বিপর্যয় : ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন
মোশাহিদা সুলতানা ঋতু

৫
সিনজেনটার বিচার করবে কে
পাভেল পার্থ

৮
হাইব্রিড ধানের চাষ : বীজ প্রতারণা বন্ধ করতেই হবে
মাহবুব হোসেন

১৩
কোম্পানির বীজ 'ঝলক' : ঝলসানো কৃষক, ক্ষতিপূরণ ও বীজের নিরাপত্তার লড়াই
কল্লোল মোস্তফা

২১
বীজ নিয়ে প্রতারণা দিশেহারা কৃষক
আলতাব হোসেন

২৪
কৃষক কি ক্ষতিপূরণ পাবে না?
শরীফুজ্জামান শরীফ, জীবনানন্দ জয়ন্ত ও নুরুল আলম মাসুদ

২৭
চীন থেকে আসা ধলক ধান, চিনচিনে ব্যথায় কৃষক
মোশাহিদা সুলতানা ঋতু

৩৩
ঝলক : সরকার কার পক্ষে বীজ কোম্পানি না কৃষকের
মাহমুদুল হাসান রুদ্র মাসুদ

ঝলক ধান বিপর্যয়ঃ ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন

মোশাহিদা সুলতানা ঋতু

২৭ সেপ্টেম্বর একটি সহযোগী জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত ঝলক ধানের ওপর রিপোর্ট পড়ে আবারও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। শিরোনাম 'নোয়াখালীর ৭ হাজার ঝলকচাষী ৫ মাস পরেও ক্ষতিপূরণ পাননি'। আগস্টে নোয়াখালী গিয়েছিলাম কৃষকদের সঙ্গে দেখা করতে। তাদের মুখ থেকে শুনতে গিয়েছিলাম- এ বছর বৈশাখে নোয়াখালীর সাত হাজার ঝলকচাষীর ১ হাজার ১৩৭ হেক্টর জমির ঝলক ধান নষ্ট হওয়া সম্পর্কে তাদের ভাষ্য। গণমাধ্যমগুলোয় যখন প্রচার করা হচ্ছে, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা অনুযায়ী তাপমাত্রার তারতম্য ঝলক ধানে ছত্রাক আক্রমণ ও বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, তখন ব্লাস্ট যে একটি বীজবাহিত রোগ এবং সমস্যা যে বীজে ছিল; সে সম্পর্কে খুব বেশি জোরালো মতামত দিতে কাউকে দেখা যায়নি। কৃষকদের মতামতও তখন অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

আগস্টের আবহাওয়াও এ বছর ততটা উত্তপ্ত ছিল না, যতটা ছিল কৃষকের ক্রোধ। বীজবিক্রেতা এনার্জি প্যাক এগ্রো লিমিটেড প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারা কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেবে। অথচ তখন পর্যন্ত তিন মাস পেরিয়ে গেছে, কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। আজ যখন লিখছি, তখন অক্টোবর। পাঁচ মাস পেরিয়ে গেছে। এর মধ্যে কিছু পটপরিবর্তন হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালকের কার্যালয় থেকে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগে চিঠি পাঠানো হয়েছে এক হাজার কৃষকের তালিকা চেয়ে। উদ্দেশ্য আগামী বোরো মৌসুমে এনার্জি প্যাক লিমিটেড সেখানকার এক হাজার কৃষককে নিজেদের খরচে ঝলক ধানের প্রদর্শনী প্লট করে দেয়ার মাধ্যমে এ ধানের গুণগত মান প্রমাণ করবে। অর্থাৎ বীজ কোম্পানিটি সাত হাজার কৃষকের ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব এড়িয়ে

মধ্যবর্তী অবস্থান নেয়ার চেষ্টা করছে। এটি কোম্পানির দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যবর্তী সমাধান হলেও কৃষকদের কাছে এ অবস্থান অগ্রহণযোগ্য। কারণ মোট ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের ৭ শতাংশের ১ শতাংশকে এ প্রদর্শনী প্লটের আওতায় এনে এনার্জি প্যাক শুধু ক্ষতিপূরণই এড়ানোর পাঁয়তারা করছে না; এর মধ্যদিয়ে তারা নিজেদের বীজের গুণগত মান পরীক্ষায় সাফল্য দেখিয়ে পূর্ববর্তী ক্ষতির কারণ হিসেবে আবহাওয়া ও কৃষকের অদক্ষতাকে দায়ী করতে চাইছে। তাছাড়া এ প্রদর্শনী প্লটকে তাদের উৎপাদিত বীজ বাজারজাতে ব্যবহার করতে চাইছে একটি কৌশল হিসেবেও। নোয়াখালীর কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রস্তাবিত এ সমাধান কৃষকরা মেনে নেননি এবং এর উৎসাহদাতা হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরকে দায়ী করছেন।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে পুরো পর্যালোচনাটি স্পষ্ট হয়ে আসে। প্রথমত. নোয়াখালী অঞ্চলে সাত হাজার কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর এক হাজার কৃষকের জমির ওপর ঝলক ধান আবাদের পরীক্ষাটি আসলে কার স্বার্থ উদ্ধার করে? দ্বিতীয়ত. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর যদি সত্যিকার অর্থে কৃষকের ক্ষতি নিয়ে চিন্তিত হয়, তাহলে সাত হাজার কৃষকের ক্ষতি হয়েছে জেনে এ ধরনের প্রস্তাবে কেন রাজি হলো? তৃতীয়ত. যদি এক হাজার কৃষকের ওপর করা পরীক্ষাটি সফল হয়, তাহলে কৃষকের সুবিধা কী? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- কী নিশ্চয়তা আছে যে, পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত বীজে সমস্যা না থাকলেও নষ্ট হয়ে যাওয়া ঝলকের বীজে সমস্যা ছিল না? সে ক্ষেত্রে কৃষকের ক্ষতিপূরণ কোথায়?

দেখা যাক, এখন পর্যন্ত কৃষকদের দুর্ভোগ কী চরম আকার ধারণ করেছে। গত বছর যে অঞ্চলগুলোয় একই ঝলক ধান লাগিয়ে বাম্পার ফলন হয়েছে, সেই ধান এ বছর লাগিয়ে ব্যাপক আকারে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কৃষকদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। হাজার হাজার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক বৈশাখের কড়া রোদে রাস্তায় নেমেছেন, ক্ষতিপূরণ দাবি করে মানববন্ধন করেছেন, চিটা ধান পুড়িয়ে জানিয়েছেন বিক্ষোভ। তারপরও এ বিষয়ে কোনো জোরালো পদক্ষেপ নেয়নি সরকার। ক্ষতিপূরণ নিয়ে প্রথম দিকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছিল বীজবিক্রেতা কোম্পানি। খবরের কাগজের লোকদের দেখলে বলেছে, কোম্পানির বীজের কারণে ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ তারা দেবে। কৃষকদের সঙ্গে আলাপে জানা যায়, বীজের প্যাকেট থেকে ফোন নম্বর সংগ্রহ করে ফোন করলে কোনো কৃষকের পরিচয় শুনলেই কোম্পানির লোকজন ফোন রেখে দেয়। কৃষকরাও খরচের ভয়ে হানা দেয় না কোম্পানির দরজায়। এদিকে কৃষকরা চরম দুঃখে কান্নাও ভুলে গেছেন।

আগস্টে নোয়াখালীর এক কৃষক সর্বস্ব হারিয়ে হাসতে হাসতে বলেছেন, 'মানববন্ধন বদ্দরলোকের কাম। মানববন্ধন কইরলে সরকার মনে করে হ্যাতাগো শীত লাগে, হেই

জন্য রোদ পোহাই। মানববন্ধন কইরা কাম নাই, রাস্তা অবরোদ কইরতে অইব।'

বীজের প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে ''সীমাবদ্ধতা- বিশ্বব্যাপি বীজ ব্যাবসার প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুযায়ী অ-মৌসুমে বীজ বপন কিংবা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিমভাবে তৈরি অপ্রত্যাশিত আবহাওয়া, মাটির গঠন দুর্বলতায় কিংবা অন্য কোন অপ্রাকৃতিক ও অস্বাভাবিক অবস্থার কারণে বিক্রীত বীজের বর্ণিত গুণাগুণ ও উৎপাদনশীলতার তারতম্যের ক্ষেত্রে কোন নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভব নয়।" অর্থাৎ প্রদর্শনী প্লটের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে রোগবিহীন বীজ থেকে ভালো উৎপাদন দেখিয়ে প্রমাণের চেষ্টা করা হবে, সমস্যা বীজের নয়, বরং সেই সময়কার আবহাওয়া বা কৃষকের দক্ষতার। গবেষণার ফল সে অর্থে কোম্পানির পক্ষেই যাবে। কিন্তু বর্তমান গবেষণা প্লটের বীজে সমস্যা না থাকলেও যে গত বছর কৃষকের কাছে বিক্রি করা বীজে সমস্যা ছিল না বা ভবিষ্যতে কৃষকের কাছে বিক্রি করা বীজে আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রার সামান্য তারতম্যে গতবারের মতো সমস্যা হবে না তার নিশ্চয়তা কী? বীজের প্যাকেটের গায়ে 'অপ্রত্যাশিত আবহাওয়ার' দায় বীজ কোম্পানি কর্তৃক না নেয়ার কথা বলা হলেও সেই 'অপ্রত্যাশিত আবহাওয়া' কী- সেটা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন কত তাপমাত্রায়, কতটুকু বৃষ্টিপাত বা জলাবদ্ধতায় এবং কী ধরনের মাটিতে বীজটি ভালো হবে, সেটা সুনির্দিষ্ট করে না বললে কোনটা প্রত্যাশিত আবহাওয়া আর কোনটা অপ্রত্যাশিত- সেটা নির্ধারিত হয় কীভাবে? এ বিষয়গুলোর মীমাংসা না করে এখন যে প্রদর্শনী প্লটের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, তাতে পরীক্ষায় সফল হলে সম্ভাবনা আছে বীজ কোম্পানির এ ক্ষতিপূরণের দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার। এতে আর যা-ই হোক, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের কোনো উপকার হবে না।

একটি কোম্পানি যখন বীজ বাজারজাত করে, তখন তাকে বীজ উইংয়ের কাছে এর গুণগত মান প্রমাণ করে বাজারজাতের সার্টিফিকেট নিতে হয়। এ বীজ বিদেশ থেকে যখন দেশে আসে, তখন বন্দরে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় কোনো সমস্যা ধরা না পড়লে স্বাভাবিক নিয়মে সে বীজ বিক্রয়কেন্দ্রে বিতরণের জন্য পাঠানো হয়। আমাদের দেশে উপজেলা পর্যায়ে লোকবলের অভাবে কোথায় কোন লটের বীজ কোন কৃষকের কাছে বিক্রি করা হচ্ছেছ, সে বিষয়ে নিয়মমাফিক কোনো রেকর্ড রাখা হয় না। ফলে বিক্রিযোগ্য বীজ কোথায়, কোন পর্যায়ে রোগাক্রান্ত হচ্ছে, সে বিষয়ে পরবর্তী সময়ে অনুসন্ধান দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে যে বীজ বিক্রি হয়, তার বিনিময়ে কোনো রসিদ দেয়া হয় না, ফলে কৃষকদের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এ বিষয়ে সরকারের অবকাঠামোগত দুর্বলতা কৃষকদের প্রতারিত হওয়ার মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং বীজ কোম্পানিগুলোও এ সুযোগ ব্যবহার করে। এই পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে কোম্পানি ও সরকার উভয় পক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিতের প্রশাসনিক কাঠামো না থাকায় শেষ পর্যন্ত সব ঝুঁকি

কৃষককেই নিতে হয়।

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, কৃষকদের ক্ষতিপূরণের নামে প্রস্তাবিত মধ্যবর্তী সমাধানটি আসলে সময় পার করে দেয়ার একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ অবস্থায় বীজবিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব এড়িয়ে এক হাজার কৃষককে আলাদা ও বিভাজন তৈরি করে কৃষকদের আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

আমাদের দেশে ব্যবসায় নৈতিকতা চর্চা, সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক ও বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা-সমালোচনা হলেও বাস্তবে খুব কম ক্ষেত্রেই ভোক্তা-অধিকার নিশ্চিত করা হয়। কৃষকের দুর্বলতাকে ব্যবহার করে কোম্পানির দায় এড়ানো নতুন নয়। বাংলাদেশে কৃষকবান্ধব প্রশাসনিক কাঠামো নেই কেন, সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে চলে আসে মৌলিক প্রশ্ন- কৃষকের স্বার্থ আসলে প্রশাসনের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ? গুরুত্বপূর্ণ যদি হয়েই থাকে, তাহলে কেন এ মধ্যবর্তী সমাধান? 'প্রতারণা' জেনেও সরকার কোম্পানির পক্ষ নিয়েছে কেন? এর বিরুদ্ধে জোরাল পদক্ষেপ নিতে হলে সচেতন জনসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। আজকে এনার্জি প্যাক এগ্রো লিমিটেড প্রদর্শনী প্লট করে ক্ষতিপূরণ এড়িয়ে যেতে সক্ষম হলে আমাদের ভবিষ্যতে এর চেয়ে বড় মাশুল দিতে হবে। কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় সরকার তথা জনগণকে এখনই ক্ষতিপূরণের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে এগিয়ে আসতে হবে।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস ডিপার্টমেন্টের অর্থনীতির প্রভাষক। লেখাটি ৭ অক্টোবর ২০১১ দৈনিক বণিকবার্তায় প্রকাশিত হয়। http://www.bonikbarta.com/2011-10-07/news/details/9012.html

সিনজেনটার বিচার করবে কে?

পাভেল পার্থ

আর মাত্র দুই মাস বাকি, ভাদ্র মাসের শেষে বীজতলায় টমেটো বীজ বুনতে হবে। কিন্তু দেশের বরেন্দ্রভূমির মাটি ক্ষুব্ধ ও সন্ত্রস্ত্র। গত বছর সিনজেনটা কোম্পানির হাইব্রিড সবল জাতের টমেটো চাষ করায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা এখনো সুবিচার ও ক্ষতিপূরণ পাননি। বরেন্দ্র এলাকার লোকজন চায়, সরকার সিনজেনটার বীজ-প্রতারণার ন্যায্য বিচার করবে।

২০১০ সালে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার হাজারো কৃষক সিনজেনটার হাইব্রিড টমেটো বীজ কিনে নিঃস্ব, প্রতারিত ও রক্তাক্ত হয়েছেন। গত শীত মৌসুমে টমেটো চাষের জন্য স্থানীয় কৃষকেরা সিনজেনটা বাংলাদেশ লিমিটেডের স্থানীয় ডিলার থেকে সবল এফ-১ হাইব্রিড টমেটো বীজ কিনে জমিতে লাগানোর পর গাছে কোনো ফল ধরেনি। প্রতারিত কৃষকেরা গোদাগাড়ী কৃষি উন্নয়ন ঐক্য পরিষদের ব্যানারে ২৩ নভেম্বর গোদাগাড়ী মহিষালবাড়ি পশুরহাটের বিক্ষোভ সমাবেশে এই টমেটো বীজ-প্রতারণার বিচার ও ক্ষতিপূরণের দাবি তোলেন। কৃষকের দাবির সঙ্গে স্থানীয় সাংসদ, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী ও নাগরিক সমাজও একাত্ম হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেছেন, যার অনুলিপি কৃষিমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কৃষিসচিব ও কৃষি অধিদপ্তরের মহাপরিচালককেও দেওয়া হয়েছে। স্মারকলিপিতে কৃষকেরা জানিয়েছেন, ২০ গ্রাম টমেটো বীজ লাগে এক বিঘা জমির জন্য। সিনজেনটার সবল এফ-১ হাইব্রিড টমেটো বীজ ২০ গ্রামের দাম ৮৫০ টাকা হলেও কৃষকদের কাছ থেকে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অন্যায়ভাবে নেওয়া হয়েছে। এক বিঘা জমি চাষ করতে প্রায় ২৫ হাজার টাকা খরচ হলেও জমিতে কোনো টমেটো গাছেই কোনো ফল হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত চার কৃষক সিনজেনটা বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও স্থানীয় পরিবেশকসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে

নভেম্বর ২০১০ তারিখে রাজশাহীর অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক হাকিম আদালতে মামলা করেন। এ নিয়ে বেশ কয়েকটি সরকারি তদন্ত হয়। রাজশাহী-১ আসনের সাংসদ বেশ জোরেশোরে সিনজেনটার বীজ-প্রতারণার বিষয়টি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন। কৃষিমন্ত্রী বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে সুরাহা করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। বীজ-প্রতারণার সাক্ষী পাঁচ হাজার কৃষক তাঁদের সুনির্দিষ্ট তথ্য ও স্বাক্ষরসহ সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। রাজশাহীতে সিনজেনটার অফিস ঘেরাওয়ের পর সিনজেনটার বিশাল সাইনবোর্ডটি সরিয়ে ফেলা হয়। সিনজেনটার এই বীজ-প্রতারণার বিষয়টি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু কোনো কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষকেরা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছেন, সিনজেনটা কি বাংলাদেশের সরকারের চেয়ে বেশি শক্তিশালী? তা না হলে সরকার কেন যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তার বিচার করতে পারছে না? সিনজেনটার টমেটো চাষ করা বরেন্দ্র অঞ্চলের নিষ্ফল জমিন ও সব হারানো কৃষকের করুণ আহাজারি, সিনজেনটার বিচার করবে কে?

মনসান্টো, ডুপন্ট, সিনজেনটা, গ্রুপই লিমাগ্রেইন, ল্যান্ড ও লেকস, বায়ার, কেডব্লিউএস এজি, সাকাটা, ডিএলএফ-ট্রাইফলিয়াম ও টাকিল এই শীর্ষ ১০ করপোরেট কোম্পানিই সারা দুনিয়ার কৃষিবীজ বাজারের প্রায় ৬৭ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। ২০০৭ সালে সিনজেনটার বীজ-বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল দুই হাজার ১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বীজের ওপর সিনজেনটার মতো করপোরেট কোম্পানিগুলোর একতরফা দখলদারির প্রতি রাষ্ট্রের যে কোনো ধরনের সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রণ নেই, তা সাম্প্রতিক টমেটো বীজ-প্রতারণার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি থেকে শুরু করে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি, উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় বাজার কমিটি, পরিবেশক সমিতি, দোকানদার মালিক সমিতি কেউ এ ঘটনার দায়দায়িত্ব নিতে চায়নি। যেন আজন্ম কোনো পাপের ফলে 'কৃষক' নামের একশ্রেণীর জন্ম হয়েছে। ফসল ফলিয়ে দেশকে বাঁচানোর দায়িত্ব তাঁদের একার, আর সেই ফসল ফলাতে গিয়ে মরা কি বাঁচার দায়দায়িত্বও কৃষকের একার। গোদাগাড়ী উপজেলাতে ২৭ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আছেন। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের রক্ত জল করা টাকায় তাঁদের বেতন দেয় সরকার। ভয়ংকর এই বীজ-প্রতারণার ঘটনায় তাঁরা কেউ কৃষকের পক্ষে দাঁড়ানোর মতো শক্তি-সাহস ও দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা যখন আদালতে বীজ-প্রতারণার মামলা করতে যান, তখন মূলত ৪২০ ধারায় প্রতারণার মামলা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখা জরুরি, বীজ হলো এক জীবন্ত প্রাণসত্তা

এবং কৃষির চলমান বংশধারা। বীজ বিষয়ে মামলা ও বিচার, বিচার-প্রক্রিয়ার ধরন কেমন হবে, তা কৃষকের পরামর্শে নির্দিষ্ট হওয়া জরুরি। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর করা জরুরি। বীজ-প্রতারণার ঘটনাটিকে ধরে রাষ্ট্র বীজ বিষয়ে তার রাষ্ট্রীয় অবস্থানের অনেক কিছুই স্পষ্ট করতে পারত। কিন্তু এত কিছুর পরও রাষ্ট্রের এই রহস্যময় দীর্ঘ এক বছরের নিশ্চুপতা বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষকের মনে আরও বেশি ক্ষোভ ও হতাশা বাড়িয়ে তুলছে।

বাংলাদেশ কৃষি মন্ত্রণালয় ২৫ জানুয়ারি ১৯৯৩ তারিখে বিজ্ঞপ্তি আকারে জাতীয় বীজনীতি ঘোষণা করে। এর আগে বাংলাদেশে জাতীয় বীজ অধ্যাদেশ, ১৯৭৭, বীজ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৭, জাতীয় বীজ বিধিমালা, ১৯৯৮ গৃহীত হয়। ৩০ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে উদ্ভিদজাত ও কৃষক অধিকার সংরণ অধ্যাদেশ, ২০০৭ নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। বীজ-সম্পর্কিত বাংলাদেশে কৃষকের পক্ষে কোনো আইন ও সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকার কারণেই বারবার সিনজেনটার মতো করপোরেট কোম্পানিরা দেশের কৃষকের সঙ্গে একটির পর একটি বীজ-প্রতারণা করে চলেছে।

এত কিছুর পরও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা মানুষের ওপর থেকে তাদের বিশ্বাস, মনোবল ও আস্থা হারিয়ে ফেলেননি। বরেন্দ্র অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা এখনো প্রবলভাবে বিশ্বাস করেন, কৃষিমন্ত্রী চাইলে কৃষকের পক্ষে দাঁড়িয়ে এক নিমিষেই এ সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারেন। বরেন্দ্র অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা বিশ্বাস করেন, আগামী টমেটো মৌসুম শুরুর আগেই নৃশংস বীজ-প্রতারণার ন্যায্য বিচার ও সিনজেনটার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চূড়ান্ত করবে রাষ্ট্র। ২০১০ সালে কেবল গোদাগাড়ীতেই চার হাজার হেক্টর জমি ছিল টমেটো চাষের ল্যমাত্রা। কিন্ত এ বছর যতই সময় ঘনিয়ে আসছে ততই হতাশা এবং উৎকণ্ঠা বাড়ছে বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষকের। বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে কৃষকের জান ও জমি বাঁচানো ছাড়া আর কোনো গতি আছে কি না, তা এখনো আমরা জানি না।

লেখক: গবেষক, প্রতিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র সংরক্ষণ। এ নিবন্ধটি ২০ জুন ২০১১ তারিখে দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত হয়। http://www.prothom-alo.com/detail/date/2011-07-20/news/171420

হাইব্রিড ধানের চাষ বীজ-প্রতারণা বন্ধ করতেই হবে

মাহবুব হোসেন

এবারে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের শুধু আমদানিকারকরা বীজের দাম দিয়ে দিলেই কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ কৃষকদের জমির সব ফসল নষ্ট হয়েছে। তাদের ঘরের খাবার কিনে খেতে হবে। বাড়তি ফসল থেকে যে আয় হতো সেটাও মিলবে না। সার ও সেচের জন্য তাদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। এসব ক্ষতিপূরণ কে দেবে? এ কারণে আইনের বিধিবিধান এখন এমনভাবে করতে হবে যাতে শুধু বীজের জন্য নয়, উৎপাদনের ক্ষতিও পুষিয়ে দিতে হবে।

গত কয়েকদিনে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে বোরো ধানের ফলন বিষয়ে দুই ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। এক ধরনের সংবাদ শিরোনাম ছিল : 'বোরোর বাম্পার ফলনে কৃষকের মুখে হাসি।' এবারে হাওর এলাকার ফসল আগাম বন্যা কিংবা পাহাড়ি ঢলে ভেসে যায়নি। আরেক ধরনের খবরে বলা হয় : হাইব্রিড ধান 'ঝলক' চাষ করে কৃষকের সর্বনাশ হয়েছে। কয়েকটি এলাকায় হাইব্রিড চাষে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা নষ্ট ধানে আগুন দিয়েছেন, এমন খবর দেখেছি। ২৫ এপ্রিল সমকালে নোয়াখালী এলাকার খবরে বলা হয় : 'নোয়াখালীর ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা ঝলক বীজ বিপণনকারী একটি কোম্পানিকে এজন্য দায়ী করেন এবং মুনাফাখোর বীজ কোম্পানির সহযোগীদেরও শাস্তি দাবি করেন। নোয়াখালীর সদর উপজেলার একজন কৃষক মুক্তিযোদ্ধা এনায়েত মেম্বারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় : 'কৃষি ব্যাংক থেকে এক লাখ ২০ টাকা ঋণ নিয়ে তিন কানি জমিতে ঝলক ধান লাগিয়ে তার পথে বসার উপক্রম হয়েছে।' নোয়াখালী জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের একজন কর্মকর্তার বক্তব্য উল্লেখ করে সমকালের খবরে বলা

হয়, জেলায় ঝলক ধান আবাদ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন ৬ হাজার ৭৯২ জন চাষির তালিকা তৈরি করা হয়েছে। দেশের আরও কয়েকটি এলাকায় এ ধরনের বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে, সমকালে মাগুরার জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের সূত্র উল্লেখ করে জানানো হয়েছে, জেলায় এবার বোরোর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল এক লাখ ৭০ হাজার টন, কিন্তু অতিরিক্ত এলাকায় চাষ এবং আশাতীত ফলনের কারণে উৎপাদন দুই লাখ টন ছাড়িয়ে যাবে।

হাইব্রিড প্রযুক্তি বাংলাদেশে আমদানি করা হয়েছে এবং এর লক্ষ্য স্পষ্ট : একই জমিতে ধানের ফলন বাড়ানো। এক সময়ে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা ইরির কাছ থেকেও উচ্চফলনশীল ধান বীজ আনা হয়েছে। বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা ব্রিতে এ থেকেই বিভিন্ন মৌসুমের উপযোগী নানা জাতের ধান বীজ উদ্ভাবন করা হয়েছে। মাগুরার একটি খবরে দেখেছি, প্রদর্শনী প্লটে ব্রি-২৮ জাতের ধানে প্রতি শতকে ফলন হয়েছে প্রায় এক মণ। এসএল-৮ জাতে প্রতি একরে একশ' মণের বেশি ফলন হবে বলে কৃষকদের আশা। হাইব্রিড ধানের ফলন বেশি পাওয়া গেলেও সমস্যা হচ্ছে, এর বীজ কৃষকরা নিজের জমি থেকে সংগ্রহ করতে পারে না। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মূলত ব্র্যাকই হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন করছে। এ বীজের মোট বাজারে ব্র্যাকের হিস্যা প্রায় ৩০ শতাংশ। অন্যদিকে ভুট্টা চাষের জন্য যত হাইব্রিড জাতের বীজ ব্যবহার করা হয় তার ৬০ শতাংশের জোগান দেয় ব্র্যাক। অন্য যেসব কোম্পানি হাইব্রিড ধানের বীজ কৃষকদের কাছে বিক্রি করে তারা মূলত তা আমদানি করে চীন থেকে। বিশ্ব অর্থনীতিতে এক নম্বর স্থান দখলের পথে এগিয়ে চলা এ দেশটি হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেছে। এ ধরনের অতিফলনশীল জাতের বীজ উৎপাদকদের সরকার থেকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়। বর্তমানে সেখানে অনেক কোম্পানি সক্রিয় রয়েছে এবং তারা বিশ্বের নানা দেশে ভালো ব্যবসা করছে। তাদের সঙ্গে অন্য দেশের প্রতিযোগীদের পক্ষে পেরেওঠা কঠিন।

হাইব্রিড বীজ আমদানি ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালা রয়েছে এবং তা যথেষ্ট কৃষকবান্ধবই বলা চলে। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক ভালো আইনের মতোই এ ক্ষেত্রেও সমস্যা একই প্রয়োগ যথাযথভাবে হয় না। আইনে বলা হয়েছে, আমদানি করা বীজ সরাসরি কৃষকদের কাছে বিক্রি করা যাবে না। বীজ আমদানি করার পর তা পরীক্ষা করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সনদপত্র নিতে হবে। তারপরই কেবল তা কৃষকদের কাছে বিক্রি করা যাবে। কিন্তু অনেক কোম্পানি সেটা না মেনে বেশি মুনাফার জন্য সরাসরি তা বাজারে বিক্রি করে দেয়। এবারে যেসব এলাকায় কৃষকের ক্ষতি হয়েছে সেখানে এ ধরনের সমস্যা হয়েছে বলেই মনে হয়। বীজ আমদানিকারকদের উচিত হবে, প্রথমে কৃষকদের আস্থা অর্জন করা। এজন্য ভালো বীজ দিতে হবে। ফলন ভালো পেলে

কৃষক অবশ্যই তাদের কাছে পরের বছরের বীজের জন্য যাবে। যারা কেবল একবারের জন্য বীজের বাজার চায়, তারা সে পথে চলতে চায় না। তারা সস্তা বীজ আনে এবং কোনোরকম পরীক্ষা ছাড়াই বিক্রি করে দেয়।

আমাদের দেশে সহজাত যেসব ধানের চাষ হয় সেগুলোর সহ্য ক্ষমতা থাকে বেশি। পোকামাকড়ের আক্রমণ তারা প্রতিরোধ করতে পারে। রোগবালাই দমনের ক্ষমতাও থাকে বেশি। হাইব্রিডে এসব থাকে না। যেসব আমদানি করা বীজ নিয়ে কৃষকরা বিপদে পড়েছেন সেগুলো চাষের আগে যদি পরীক্ষা করা হতো তাহলে এসব সমস্যা অবশ্যই ধরা পড়ত।

এবারে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের শুধু আমদানিকারকরা বীজের দাম দিয়ে দিলেই কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ কৃষকদের জমির সব ফসল নষ্ট হয়েছে। তাদের ঘরের খাবার কিনে খেতে হবে। বাড়তি ফসল থেকে যে আয় হতো সেটাও মিলবে না। সার ও সেচের জন্য তাদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। এসব ক্ষতিপূরণ কে দেবে? এ কারণে আইনের বিধিবিধান এখন এমনভাবে করতে হবে যাতে শুধু বীজের জন্য নয়, উৎপাদনের ক্ষতিও পুষিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় বেসরকারি খাতের আমদানিকারকদের দ্বারা কৃষকদের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাবে। দেশে বর্তমানে কয়েকটি কোম্পানি হাইব্রিড জাতের ধানবীজ আমদানি করছে। এদের একটি অংশ বীজ প্রকল্পে পরীক্ষা করার পর বাজারে বিক্রির জন্য দিচ্ছে। আবার কেউ কেউ সরাসরি কৃষকদের কাছে বিক্রি করছে। ব্র্যাক দেশেই এ ধরনের বীজ উৎপাদন করছে। কিন্তু ঝলক ধানের মতো দু'চারটি কোম্পানির কারণে বদনাম হচ্ছে সব কোম্পানির। ফলে কৃষকরা এ ধরনের ধানের চাষে উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে পারেন।

আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হাইব্রিড চাষের প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণত হাইব্রিড ধানের বীজ থেকে প্রতি বিঘা জমিতে ২৪ থেকে ২৭ মণ ধান পাওয়া যায়। অন্যদিকে প্রচলিত ইরি জাত থেকে পাওয়া যায় বিঘায় ২০ মণ। দেখা যায়, যেহেতু হাইব্রিড বীজের দাম বেশি এবং অন্যান্য উপকরণও কিছুটা বাড়তি লাগে, তাই এ ধরনের জমিতে কৃষকরা বিশেষ যত্ন নেন। এর ফল পাওয়া যায় ফলনে উৎপাদন যা হওয়ার কথা, মেলে আরেকটু বেশি।

বাংলাদেশে চাষের জমির পরিমাণ প্রতিনিয়ত কমছে। অন্যদিকে বাড়ছে লোকসংখ্যা। এ অবস্থায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অতিফলনশীল জাতের ধান, গম, ভুট্টা ও বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এভাবে ফলন বাড়ানো গেলে আগামী অন্তত এক দশক বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্যের জোগান নিয়ে আমাদের তেমন উদ্বিগ

হতে হবে না। বর্তমানে বোরো মৌসুমে মোট জমির প্রায় ১৫ শতাংশে হাইব্রিড জাতের চাষ হয়। এটা ৬০ শতাংশ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সমস্যা দুটি : এক. বীজের জন্য ব্যয় পড়ে বেশি। সাধারণত দেশি প্রচলিত জাতের ক্ষেত্রে চাষাবাদের ব্যয়ের ২ শতাংশের মতো বীজের পেছনে ব্যয় হয়। কিন্তু হাইব্রিডের ক্ষেত্রে ব্যয় হয় ৬ শতাংশ। দুই. বিদ্যমান ব্রি জাতের তুলনায় হাইব্রিড ধানের ভাতের মান কিছুটা খারাপ। ব্রি-২৮ জাতের চাষ হয় ব্যাপক এবং তার ভাত শুধু দরিদ্র নয় মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীরও পছন্দ। তাছাড়া ব্রি জাতের পান্তা সুস্বাদু। কিন্তু হাইব্রিড জাতের চালের ভাত গরম থাকতে থাকতে খেয়ে ফেলতে হয়। অন্যথায় ভাত কিছুটা নরম হয়ে যায়। বাংলাদেশে পান্তা ভাতের চলন যে ব্যাপক তার অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। পান্তা ভাত আগের রাতের ভাত থেকেই পানি ঢেলে পাওয়া যায়। সকাল হতে না হতেই তা খেয়ে কৃষক ও মজুররা কাজে চলে যেতে পারেন। অন্যথায় তাকে সকালে নাশতা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। হাইব্রিড ধানের এ ধরনের সমস্যার জন্যই বাজারে ব্রি-২৮ জাতের ধান বিক্রি করে যেখানে প্রতি ৪০ কেজিতে ৯০০ টাকার মতো পাওয়া যায়, হাইব্রিডে পাওয়া যায় ৮০০ টাকা। হাইব্রিড জাতের চাষ শুরুর সময়ে অল্প পরিমাণ জমিতে তা ফলত। ফলে ব্যবসায়ীরা ব্রি জাতের সঙ্গে তা মিশিয়ে বাজারে বিক্রি করত এবং ক্রেতারা ধরতে পারত না। কিন্তু এখন চাষ বাড়ছে। ফলে ব্যবসায়ীরা আর ভালো-মন্দ মিশিয়ে তা বিক্রি করতে পারেন না।

হাইব্রিড বীজের জন্য কৃষককে ৬ শতাংশ বেশি ব্যয় করতে হয়। আবার বাজারে বিক্রি করে দাম মেলে ১০ শতাংশ কম। অন্যদিকে উৎপাদন বেশি হয় ২০ শতাংশ। অর্থাৎ বাড়তি লাভ ৪ শতাংশ। কিন্তু এতে পান্তা ভাত মেলে না। এমন চিত্র হাইব্রিড জাতের চাষ ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টি করে না। এখন সময় এসেছে ধানের ফলন বাড়ানোর পাশাপাশি মান নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করে তার সুফল কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জরুরি পদপেক্ষ গ্রহণের। এখন দেখা যায়, স্বল্প আয়তনের জমি যাদের তারা হাইব্রিড জাতের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে। কিন্তু বাজারে যারা বাড়তি ধান বিক্রি করে তাদের আগ্রহ কম। এ অবস্থার পরিবর্তন কাম্য।

দেশে এখন হাইব্রিড জাতের সবজি ও ফলের চাষও হচ্ছে। এ নিয়ে তেমন সমস্যার কথা শোনা যায় না। বাজারে অনেক বড় মুলা আসছে। কোনো কোনোটা তো এক কেজি ওজনেও হয়ে থাকে। বাজারে অঢেল তরমুজ দেখা যায় বড় আকারের। কুমড়া ও লাউচাষিরাও হাইব্রিড বীজ ব্যবহার করেন। এ ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত বিচারে অর্থনীতির বিষয়টি আসবে। কারণ মুলার আকার বেশি বড় হলে তার ক্রেতা পাওয়া সহজ হবে না। তরমুজ বেশি বড় হলে একদিনে খেয়ে শেষ করা যায় না। এ ধরনের আরও কিছু সমস্যা রয়েছে,

যার সমাধান রয়েছে বিজ্ঞানীদের হাতে।

হাইব্রিড জাতের ধানের চাষ যখন বাড়ানোর জন্য কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তখন 'বীজ-প্রতারণা' কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ সমস্যার সমাধান করতে হবে জরুরি ভিত্তিতে এবং এ ক্ষেত্রে মূল বিবেচনায় রাখতে হবে কৃষকের স্বার্থ।

লেখক: ড. মাহবুব হোসেন : কৃষি বিশেষজ্ঞ এবং প্রধান নির্বাহী, ব্র্যাক। ২৭ এপ্রিল ২০১১ দৈনিক সমকালে প্রকাশিত
http://www.samakal.com.bd/details.php?news=20&view=archiev&y=2011&m=04&d=27&action=main&menu_type=&option=single&news_id=151700&pub_no=675&type=

কোম্পানির বীজ "ঝলক" ঝলসানো কৃষক, ক্ষতিপূরণ ও বীজ নিরাপত্তার লড়াই

কল্লোল মোস্তফা

"আগাছা ছাড়াই, আল বাধি, জমি চষি, মই দিই/বীজ বুনি, নিড়োই, দিনের পর/দিন চোখ মেলে রাখি শুকনো আকাশের দিকে। ঘাম ঢালি/খেত ভ'রে, আসলে রক্ত ঢেলে দিই/নোনা পানি রুপে; অবশেষে মেঘ ও মাটির দয়া হ'লে/খেত জুড়ে জাগে প্রফুল্ল সবুজ কম্পন/খরা, বৃষ্টি, ও একশো একটা উপদ্রব কেটে গেলে/প্রকৃতির কৃপা হ'লে একসময় মুখ দেখতে পাই থোকা থোকা সোনালি শস্যের.."(তৃতীয় বিশ্বের একজন চাষীর প্রশ্ন- হুমায়ুন আজাদ)।

এই বাজারি যুগে শুধু কৃষকের রক্ত-ঘাম ঢালা শ্রম আর প্রকৃতির কৃপা হলেই চলে না, বীজ কোম্পানির ওপরও নির্ভর করতে হয় ফসলের সোনা মুখ দেখতে। গত বোরো মৌসুমে ভূমিহীন কৃষক আজগর আলি ৩ একর জমি বিভিন্ন জনের কাছ থেকে বর্গা নিয়ে মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে ২৫ হাজার টাকা ধার করে দেশী উফশী জাতের বীজের তুলনায় ৮/১০ গুণ বেশি দামের চীনা হাইব্রিড ঝলক ধানের চাষ করেছিলেন। কৃষি অধিদপ্তরের স্থানীয় মাঠকর্মীদের কথা শুনে এবং স্থানীয় কেবল টিভিতে আমদানীকারক কোম্পানি এগ্রো-জি'র (http://www.agro-g.com/news_details.php?nid=9) দেয়া বিজ্ঞাপন দেখে আজগর আলী আশা করেছিলেন দেশী জাতের চেয়ে বেশি ফলন ক্ষমতার এই হাইব্রিড ঝলক ধান (এগ্রো-জি ১) পাকলে চাষের খরচ, মহাজনের ঋণের সুদ-আসল দিয়ে থুয়ে অন্তত ১০০ মণ ধান তার লাভ হিসাবে থাকবে। প্রতিমণ ৮০০ টাকা করে হলে এভাবে ৮০ হাজার টাকা তার হাতে আসার কথা। এটাই তার সারা বছরের খোরাকি জোটাবে। কারণ আজগর আলী যে অঞ্চলের মানুষ সেই নোয়াখালির বেশির ভাগ জমিই কয়েক যুগ ধরে জলাবদ্ধতার সমস্যাক্রান্ত হওয়ায় কেবল বোরো মৌসুমেই আবাদ যোগ্য।

কিন্তু আজগর আলীর মতো এরকম অসংখ্য কৃষকের চাষ করা সাধের হাইব্রিড ঝলক ধান নষ্ট হয়ে গেছে, ধান পোক্ত হওয়ার আগেই শীষ শুকিয়ে গেছে। একদিকে মহাজনের কাছ চড়া সুদে নেয়া ঋণের বোঝা আর অন্যদিকে পরিবারের খোরাকি যোগাড়ের অনিশ্চয়তা নিয়ে দিন কাটছে তাদের।

বোরো মৌসুমে নোয়াখালি অঞ্চলের ১ হাজার ৬৬৫ হেক্টর জমিতে ঝলক ধান চাষ হয় যার মধ্যে ৪৬৫ হেক্টর জমির ফসল পুরোপুরি এবং বাদবাকি জমির ফসলও অনেকাংশে নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু নোয়াখালী নয়, এ বছর সারাদেশে সিলেট, সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চুয়াডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনা ও কুমিল্লা অঞ্চলের যেখানেই ঝলক চাষ হয়েছে, প্রায় সর্বত্রই ফসল বিপর্যয় দেখা দেয়। হাইব্রিড ঝলক বীজের সমস্যার কারণে একযোগে সারাদেশে ফসল বিপর্যয় ঘটার ক্ষতিপূরণ দাবি করে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকরা আন্দোলন সংগ্রাম-মানববন্ধন-সমাবেশ-স্মারকলিপি প্রদান-নষ্ট ধান পোড়ানো কর্মসূচি পালন করলেও সরকার ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের পাশে দাড়ায়নি, বীজ কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা তো দূরের কথা চীন থেকে আমদানীকৃত WINALL HIGHTECH COMPANY (http://winall.globalimporter.net)র উৎপাদিত এই হাইব্রিড বীজের সমস্যার কারণেই যে এই বিপর্যয়টি ঘটেছে সেটাই আড়াল করতে চাইছে।

সরেজমিন অনুসন্ধান:

ঝলক ধান বিপর্যয়ের বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্য আমরা কয়েকজন গত ২৯ জুলাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা নোয়াখালীতে যাই। স্থানীয় সাংবাদিক, এনজিও কর্মকতা, রাজনৈতিক কর্মী, কৃষিবিদ, কৃষি অধিদপ্তরের কর্মকতাসহ নোয়াখালী সদর এবং বেগমগঞ্জ উপজেলার কৃষকদের সাথে এ বিষয়ে আমাদের কথা হয়। ভূমিহীন কৃষক আজগর আলী, মুক্তিযোদ্ধা কৃষক এনায়েত মেম্বার কিংবা তরুণ কৃষক শিমুলের সাথে সেখানেই পরিচয়।

কৃষি মন্ত্রণালয় গঠিত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি)'র তদন্ত দল কিংবা বীজ কোম্পানির পক্ষ থেকে এই ফসল বিপর্যয়ের জন্য বিরূপ আবহাওয়া /হঠাৎ নিম্ন তাপমাত্রার কারণে নেক ব্লাস্ট রোগ হওয়ার কথা প্রচারের ব্যাপারটি তুললে তারা পরিস্কার যুক্তি দিয়ে বলেন, একই এলাকায় পাশাপাশি জমিতে দেশীয় বিআর জাতের ধান, আরেকটি হাইব্রিড হীরা ধানের সাথে ঝলকের চাষ হয়েছে, আবহাওয়া কিংবা তাপমাত্রার কারণে হলে তাহলে অন্য জাতের ধানের কোন ক্ষতি না হলেও কেবল ঝলক ধান-ই নষ্ট হলো কেন? আর শুধু নোয়াখালী না সারাদেশে যেখানেই ঝলক চাষ হয়েছে সেখানেই একই ঘটনা ঘটেছে। ফলে তারা এ বিষয়ে নি:সন্দেহ যে সমস্যাটি বীজেই ছিলো। স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা ও কৃষিবিদের বক্তব্যও অনুরূপ।

তিনি মনে করেন, বীজের মধ্যে রোগের উৎপাদন (নেক ব্লাস্ট ছত্রাকজনিত রোগ) বা অন্য কোন দুর্বলতা সুপ্ত অবস্থায় ছিলো বলেই নেক ব্লাস্ট ছড়ানোর অনুকূল আবহাওয়া পাওয়া মাত্রই সারা দেশেই ঝলক ধানে রোগটি ছড়িয়েছে কিন্তু অন্য জাতের ধানের ক্ষেত্রে তেমন ঘটেনি। ফলে বীজে সমস্যা নেই বলে পার পাওয়ার কোন উপায় কোম্পানির নেই। হয়তো এ ধরণের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই এগ্রো-জি বীজের প্যাকেটের গায়ে লিখে রেখেছে: ''সীমাবদ্ধতা- বিশ্বব্যাপি বীজ ব্যবসার প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুযায়ী অ-মৌসুমে বীজ বপন কিংবা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিমভাবে তৈরি অপ্রত্যাশিত আবহাওয়া, মাটির গঠন দুর্বলতায় কিংবা অন্য কোন অপ্রাকৃতিক ও অস্বাভাবিক অবস্থার কারণে বিক্রীত বীজের বর্ণিত গুনাগুন ও উৎপাদনশীলতার তারতম্যের ক্ষেত্রে কোন নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভব নয়।"

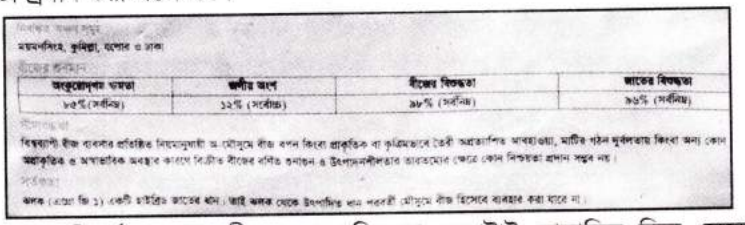

ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও ঢাকা

অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা	জলীয় অংশ	বীজের বিশুদ্ধতা	জাতের বিশুদ্ধতা
৮৫% (সর্বনিম্ন)	১২% (সর্বোচ্চ)	৯৮% (সর্বনিম্ন)	৯৬% (সর্বনিম্ন)

বিশ্বব্যাপী বীজ ব্যবসার প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুযায়ী অ-মৌসুমে বীজ বপন কিংবা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিমভাবে তৈরী অপ্রত্যাশিত আবহাওয়া, মাটির গঠন দুর্বলতায় কিংবা অন্য কোন অপ্রাকৃতিক ও অস্বাভাবিক অবস্থার কারণে বিক্রীত বীজের বর্ণিত গুনাগুন ও উৎপাদনশীলতার তারতম্যের ক্ষেত্রে কোন নিশ্চয়তা প্রদান সম্ভব নয়।

ঝলক (এগ্রো জি ১) একটি হাইব্রিড জাতের ধান। তাই ঝলক থেকে উৎপাদিত ধান পরবর্তী মৌসুমে বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

আবহাওয়ার বিপর্যয়ের দায় বীজ কোম্পানির না নেয়াটাই স্বাভাবিক কিন্তু সেক্ষেত্রে নিশ্চিত ভাবেই প্রশ্ন আসে তাহলে ঐ বীজের জন্য আদর্শ বা সহনীয় আবহাওয়াটা আসলে কি? সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন কত তাপমাত্রায়, কতটুকু বৃষ্টিপাত বা জলাবদ্ধতায় এবং কি ধরণের মাটিতে বীজটি ভালো হবে, সেটা সুনির্দিষ্ট করে না বললে কোনটা অনুকূল আবহাওয়া আর কোনটা প্রতিকুল সেটা নির্ধারিত হবে কি ভাবে? ফলে এ ধরণের ফাপা দায়মুক্তি কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বীজের প্রতিশ্রুত মান নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষতিপূরণ

ঝলক বীজের চকচকে প্যাকেটের গায়ের জ্বলজ্বল করছে লোভনীয় কিছু প্রতিশ্রুতি:

- সঠিক চাষে একর প্রতি ফলন ১২০ থেকে ১৩৫ মণ;
- ধান মাঝারি চিকন ও লম্বা, ভাত ঝরঝরে ও সুস্বাদু;
- গাছ হেলে পড়ে না, শীষে চিটা হয় না এবং ধান ঝরে পড়ে না।

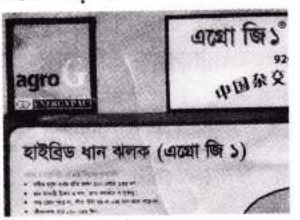

কিন্তু বেশি ফলন তো দূরের কথা, কোন ফলনই বেশির ভাগ কৃষক পায়নি ঝলক থেকে। একর প্রতি ফলন শূন্য। শীষে চিটা হয়েছে, ধান ঝরে পড়েছে। ভাত সুস্বাদু কিনা বোঝা যায়নি কিন্তু খড় গরুও খেতে চায়নি! তাহলে প্রশ্ন হলো, বীজ আমদানী ও বাজারজাতকরণের বেলায় বীজ নিবন্ধন ও মান নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কি করেছে? জাতীয় বীজ নীতি'র আর্টিক্যাল ৯.৬

অনুসারে "বীজের মান নিশ্চিতকরণের জন্য লেবেলে বর্ণিত মান এবং প্যাকেটে অথবা পাত্রেস্থিত বীজের মান সমান হতে হবে।" আর্টিক্যাল ৮.২ অনুসারে, কোন বীজ বাণিজ্যিকভিত্তিতে আমদানির আগে পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে ফিল্ড টেস্ট করতে হয়। ফিল্ড টেস্ট এ প্রতিশ্রুত মান ও গুণাগুণ প্রমাণিত হলেই কেবল বীজ আমদানির অনুমোদন দেয়া হয়। এরপর প্রতিবছর আমদানির বেলায় বীজ বিদেশ থেকে দেশে ঢোকার সময়ই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কোরেন্টাইন সেন্টারে রেখে পরীক্ষা নীরিক্ষা করা হয় যে এতে কোন রোগজীবাণু আছে কি-না। আর্টিক্যাল ১১.৪ অনুসারে বীজ অনুমোদন সংস্থার কাজ হলো, "পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে বিক্রোয়োত্তর পর্যায়ে মান নিয়ন্ত্রণ করা", "উৎপাদনে দুর্বলতা দেখা গেলে, রোগ ও পোকামাকড়ের সন্দেহ থাকলে জাতীয় বীজ বোর্ডকে উক্ত জাতের অনুমোদন বাতিল করার উপদেশ প্রদান" যদিও বীজ নীতি/আইনের কোথাও বলা নেই লেবেলে উল্লেখিত গুণাগুণের ব্যতিক্রম ঘটলে আমদানিকারক বা উৎপাদনকারী কোম্পানির কাছ থেকে কোন ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে কি-না!

বীজের মাননিয়ন্ত্রণের জন্য বীজ নীতিতে যতটুকুই আছে, ঝলক ধানের বেলায় কি সেগুলো অনুসরণ করা হয়েছে? চীনা কোম্পানি উইনঅল হাইটেকের উৎপাদিত এগ্রোজি-১ বা ঝলক ধান এনার্জি প্যাকের এগ্রো জি কোম্পানি কর্তৃক দেশে আমদানি করার বেলায় কি এবার সে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে? তাহলে পরীক্ষায় কোন সমস্যা ধরা পড়ল না কেন? বীজ প্যাকেটজাত করার আগে বীজ কোম্পানি কি যথাযথ ভাবে বীজ ট্রিটমেন্ট করেছিল? বিক্রোয়োত্তর পর্যায়ে মান নিয়ন্ত্রণ করা তো দূরের কথা বিক্রির সময় ডিলাররা কৃষকদেরকে যে বীজ বিক্রির রশীদ পর্যন্ত প্রদান করেনা, তা ঠেকানোর ব্যবস্থা কি করা হয়েছে? লক্ষ একরের বেশি জমির ফসল নষ্ট হওয়ার পরও কোম্পানির বিরুদ্ধে কি কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে? আর্টিক্যাল ১১.৪ অনুসারে বীজ অনুমোদনের বাতিল করার প্রস্তাব করা হয়েছে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা জরুরি। কারণ প্রায়ই দেখা যাচ্ছে বেসরকারি কিংবা বিদেশী কোম্পানির বীজ কিনে প্রতারিত হচ্ছে কৃষকরা। হাইব্রিড ধান ঝলকের পাশাপাশি বহুজাতিক সিনজেনটা উৎপাদিত হাইব্রিড টমোটো সুবল চাষ করেও প্রতারিত হয়েছে রাজশাহীর গোদাবাড়ির কৃষকরা। ২০১০ সালের রবি মৌসুমে রাজশাহীর গোদাবাড়ি উপজেলার সাড়ে আট হাজার কৃষক ছয় হাজার হেক্টর জমিতে সুবল জাতের টমেটো বীজ চাষ করে কোন ফলন পাননি। দেশের বিএডিসি উৎপাদিত বিভিন্ন জাতের উচ্চফলন শীল বা হাই ইয়েল্ডিং ভেরাইটির ক্ষেত্রে তো এরকম বিশাল আকারের বিপর্যয় ঘটতে দেখা যায় না, তাহলে কেন বারবার হাইব্রিড বীজের বেলায় এরকম ঘটছে? আগামী বছরেও যে ঝলক বা বিজলী কিংবা হীরা বা যে কোন হাইব্রিড বীজ কিনে প্রতারিত হবে না কৃষকরা তার নিশ্চয়তা কি? শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কৃষকের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য

করা কিংবা বীজ অনুমোদন বাতিলের প্রস্তাব তো দূরের কথা এ বছর এগ্রো-জি কোম্পানিকে ১৫ মেট্রিকটন ঝলক বীজ আমদানির অনুমতি দিয়েছে সরকার!

হাইব্রিড বীজ ও খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্ন:

দেশের ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা এবং ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমির বাস্তবতায় বরাবরই সমাধান হিসেবে সরকারি-বেসরকারি-দেশী-বিদেশী সকল পর্যায় থেকে হাইব্রিড শস্য আবাদের প্রেসক্রিপশন দেয়া হয়ে থাকে। এর পেছনে যুক্তি হলো প্রতি একক জমিতে হাইব্রিড বীজে দেশীয়/উফশী জাত থেকে বেশি ধান উৎপাদিত হয়। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বেশি উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক সন্দেহ নাই কিন্তু এই বেশি উৎপাদন কৃষকের জন্য বেশি ঝুকিপূর্ণ পরিস্থিতির তৈরি করে কিনা, কৃষকের জন্য তা লাভজনক কি-না, দীর্ঘ মেয়াদে তা জমি ও পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে কি করে না ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা না করে কেবল বেশি উৎপাদনের হিসাব কষাটা কিন্তু মোটেই নিরাপদ নয়। স্থানীয় জাতের ধানের বদলে উচ্চ ফলনশীল বা উফশী ধানের ব্যাবহারের ফলে খাদ্য নিরাপত্তা বেড়েছে না কমেছে তা নিয়ে বিতর্ক আছে। স্থানীয় জাতের ধানের ফলন কম হলেও সার-কীটনাশক-সেচ কম লাগত কিন্তু সবুজ বিপ্লবের সময় উচু মাত্রার রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারকারী উফশী ধানের চাষে আপাতত ফলন বাড়লেও দীর্ঘ মেয়াদে অতিরিক্ত সারের ব্যবহারে জমির উর্বরতা হ্রাস, কীটনাশক ব্যবহারে উপকারী পরাগায়ী পতঙ্গ ধ্বংস ইত্যাদি কারণে দীর্ঘ মেয়াদে জমির ক্ষতি হচ্ছে ফলে খাদ্য নিরাপত্তা উল্টো ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বলে মতামত রয়েছে। এখন এর মধ্যে উফশীর চেয়েও বেশি সার-কীটনাশক-বালাইনাশক ব্যাবহারকারী এবং বন্ধ্যা বীজের হাইব্রিড উফশীর চেয়ে বেশি ফলন দিলেও বীজ নিরাপত্তার নিরিখে কতটা গ্রহণযোগ্য সেই প্রশ্নটা মাথায় রাখা জরুরি।

হাইব্রিডের সুবিধা:

হাইব্রিড বীজের সবচেয়ে বড় সুবিধার কথা বলা হয় প্রতি একক জমিতে এর ফলন অন্য যে কোন দেশী জাতের তুলনায় বেশি। হাইব্রিড বীজ বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান ব্র্যাকের পৃষ্ঠপোষকতায় করা একটি গবেষণা (Hybrid Rice Adoption in Bangladesh: A Socioeconomic Assessment of farmers Experiences by AM Muazzam Husain, Mahabub Hossain, Aldas Janaiah) থেকে এ বেশি ফলনের পরিসংখ্যানটুকু চলুন দেখে নেই:

ধানের জাত	উতপাদন(টন/হেক্টর)
হাইব্রিড অলোক	৫.৮১
হাইব্রিড সোনার বাংলা	৭.৪৮
উফশী বিআর-২৯	৬.৩২
উফশী বিআর-৬	৬.৭২
উফশী বিআর-২৮	৬.৪২

দেখা যাচ্ছে হাইব্রিড অলোকের তুলনায় উফশী জাতের ফলন বেশি এবং হাইব্রিড সোনার বাংলার ফলন উফশীর তুলনায় ১১% থেকে ১৮% বেশি! আরেকটি বিষয় হলো, ধান থেকে চাল উৎপাদনের পরিমাণ সব ক্ষেত্রেই হাইব্রিডের তুলনায় বিআর ধানের বেশি। যেমন বিআর-৬ এর ধান/চাল অনুপাত হলো ৬৮.৭৫ কিন্তু অলোকের ধান/চাল অনুপাত ৬২.৭ এবং সোনার বাংলার ৬৫%। এবার দেখা যাক এই বাড়তি ফলনটুকু পেতে গেলে কী কী ঝুকি কৃষকের ওপর বর্তায়:

হাইব্রিড ঝুকি ১:

হাইব্রিড বীজের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এটি বন্ধ্যা বীজ অর্থাৎ উৎপাদিত ধানকে পুনরায় বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যায়না, সেক্ষেত্রে এর হাইব্রিড ভিগর (হাইব্রিড তেজ) বা হেটারোসিস নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কৃষককে বীজের জন্য বিদেশী/বেসরকারি কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল হতে হয় যেসব কোম্পানি মূল লক্ষ্য মুনাফা সর্বোচ্চকরণ। ফলে এসব কোম্পানির বীজ মনোপলির গ্যারাকলে আটকে কৃষক ক্রমশ কেজি প্রতি বীজে বাড়তি দাম দিতে বাধ্য হচ্ছে। এর একটা সমাধান হতে পারে বিদেশী/বেসরকারি কোম্পানির বদলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিএডিসি কর্তৃক হাইব্রিড বীজ উৎপাদন ও স্বল্পমূল্যে বাজারজাতকরণ। বীজকে ক্রমশ কর্পোরেটাইজ করার বীজ নীতি প্রণয়নকারী এবং বিএডিসিকে ক্রমশ অকার্যকর ও সারাদেশের মোট প্রয়োজনীয় বীজের খুব সামান্য অংশ সরবরাহ করা একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে যে শাসক শ্রেণী তাদেরকে যদি এই কাজটি করতে বাধ্য করা যায়ও সেক্ষেত্রেও হাইব্রিডের বাদবাদি ঝুঁকিগুলো থেকেই যায়।

হাইব্রিড ঝুকি ২:

উফশী জাতের তুলনায় হাইব্রিড জাতের ধান চাষের খরচ বেশি। বাড়তি খরচের একটি তুলনা নিচে দেয়া হলো:

খরচের উল্লেখ যোগ্য খাত	দেশী উফশী'র খরচ(টাকা/হেক্টর)	হাইব্রিডের খরচ(টাকা/হেক্টর)
বীজ	৫৭৯	২৩৬৯
জৈব সার	৬৬৪	১১৬৯
রাসায়নিক সার	৩২৩২	৪০১৯
সেচ	৪৫০৭	৪৮০১
কীটনাশক	৯০৫	১৫১০

ফলে হাইব্রিডে বাড়তি ধান উৎপাদিত হয় ঠিকই কিন্তু তার জন্য খরচও করতে হয় বাড়তি। বাড়তি ধান উৎপাদিত করে বাজারে বিক্রয় করলে যে লাভ কৃষকের থাকে তাতে কি বাড়তি বিনিয়োগের সাপেক্ষে যথেষ্ট, দেশী উফশী ধানের সাথে একটা তুলনা করা যাক।

ধানের জাত	খরচ(টাকা/হেক্টর)	বিক্রয় মূল্য(টাকা/হেক্টর)	লাভ	বিনিয়োগের তুলনায় লাভ
হাইব্রিড	২৩,৪৫১	৪২৬৫৯	১৯২০৭	৮১.৯০%
উফশী	১৯১২১	৩৬৭২৭	১৭৬০৬	৯২.০০%

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে হাইব্রিড ধানের বেলায় বিনিয়োগের তুলনায় লাভের পরিমাণ উফশীর চেয়ে ১০% এর অধিক কম। যত দিন যেতে থাকবে জমিতে প্রযোজ্য সার, বীজের পরিমাণ/দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকলে দেশী জাতের তুলনায় হাইব্রিডের লাভজনকতা কমতে থাকবে।

হাইব্রিড ঝুকি ৩:
রোগবালাই প্রতিরোধের ক্ষমতা স্থানীয় জাতের তুলনায় উফশী জাতের কম। হাইব্রিড জাতের ক্ষেত্রে তা আরো কম। ফলে ল্যাবরেটরির নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে যে হাইব্রিড পুষ্ট ও সবল দানা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হবে, সে হাইব্রিড ধানই আবহাওয়া, তাপমাত্রা ও জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে সহজে খাপ খাওয়াতে না পারায় সময় সময় ফলন বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে। রোগবালাই ও কীটপতঙ্গের আক্রমণে হাইব্রিড ধানে সহজে কাতর হওয়ার পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে ব্র্যাকের করা গবেষণাটি থেকে:

ক. উফশী ধানের বেলায় যেখানে ৭৬% ক্ষেত্রে কীটনাশক ব্যাবহার করতে হয়েছে, হাইব্রিড অলোক ও সোনার বাংলা ধানের বেলায় তার হার যথাক্রমে ৯৪% ও ৮৮% ক্ষেত্রে।

খ. রোগবালাই ও পতঙ্গের আক্রমণে উফশী জাতের ক্ষেত্রে ফসলের ক্ষতির পরিমাণ ২০% এর নিচে থাকলেও হাইব্রিড জাতের ফসল একবার আক্রান্ত হলে ফসলের ক্ষতির পরিমাণ গড়ে মোট ফসলের ৩০% এর বেশি দেখা গিয়েছে।

গ. উফশী জাতের তুলনায় হাইব্রিডের জন্য কীটনাশক ব্যবহারের খরচ ৬৭% বেশি।

কোম্পানি-বান্ধব রাষ্ট্র ও কৃষকের ক্ষতিপূরণের লড়াই
সকল দিক বিবেচনা করলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার সাথে কৃষকের বীজ নিরাপত্তা ও বীজের অধিকারের প্রশ্নটি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। অথচ কোম্পানি-বান্ধব রাষ্ট্রের সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নাই। আমরা থাকা অবস্থাতেই নোয়াখালীর মাইজদীতে সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় এক বীজ মেলা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে অবাধে এগ্রোজি, এসিআই কিংবা ব্র্যাকের মতো হাইব্রিড বীজ আমদানিকারক ও উৎপাদনকারক কোম্পানিগুলোর বীজের বিক্রয় ও প্রদর্শনী চলছে। অবশ্য এরকমটাই তো হওয়ার কথা। দেশী-বিদেশী কোম্পানি বান্ধব রাষ্ট্রের বীজ নীতিতে এরকমটাই বলা আছে:

- বিশেষ করে বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে আমদানির সুযোগ প্রদান করে উন্নতমানের বীজ ও রোপন সামগ্রী সংগ্রহ ও প্রবর্তন করা হবে; (আর্টিক্যাল ৩.৩)

- যে সকল বীজ বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হচ্ছে সেগুলোর উৎপাদন থেকে বিএডিসি

ধীরে ধীরে সরে আসবে(আর্টিক্যাল ১১.২.২ এর খ)

❍ উপজেলা পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ বিক্রয়কেন্দ্রগুলো ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করে বেসরকারি বীজ ডিলারগণকে সেস্থলে নিয়োজিত করা হবে। (আর্টিক্যাল ১১.২.৫)

আর এভাবে বেসরকারি খাতের পাল্লায় পড়ে ঝলক ধানের মতো ফসল বিপর্যয়ে কৃষক সর্বস্ব হারালেও তার ক্ষতিপূরণের কোন দায় রাষ্ট্র কিংবা বীজ কোম্পানি কারো ওপরে বর্তাবে না।

অবশ্য কৃষকরা বীজ নীতি/বীজ আইনে ক্ষতিপূরণের কোন ধারা না থাকলেও লড়াই করে ক্ষতিপূরণ আদায় করার ব্যাপারে আশাবাদি। তারা মনে করেন স্রেফ ভালো ফলনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে প্রতারণা বীজ কোম্পানি তাদের সাথে করেছে, সেই প্রতারণার অভিযোগেই বীজ কোম্পানির শাস্তি ও ক্ষতিপূরণ আদায় সম্ভব। তারা বলেছেন মানব বন্ধন-সমাবেশ-স্মরকলিপি প্রদান অনেক হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মাঝখানে আন্দোলনে একটু ভাটা পড়লেও স্থানীয় ক্ষেতমজুর সমিতি ও অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের সাথে তারা কথা বলছেন সামনের আন্দোলণের ব্যাপারে। এবার 'রাস্তার পাশে খাড়াই রোইদ পোয়ানো'র মানবন্ধন জাতীয় কর্মসূচির মধ্যে তারা আর নাই, একেবারে রাস্তা অবরোধ করে রেখে ক্ষতিপূরণ আদায়ের কর্মসূচি নিতে চান তারা। আমরা কৃষকের এই ক্ষতিপূরণ আদায় ও বীজ নিরাপত্তার আন্দোলনের সাথে সংহতি জানাই।

আমাদের মতো দোকান থেকে সরু চাল কিনে খাওয়া মধ্যবিত্তের পক্ষে কৃষকের কাতারে দাঁড়িয়ে একমুঠো পুষ্ট বীজ, এক গন্ডা জমির সোনালি ধানের গুরুত্ব বোঝা একটু মুশকিল। কিন্তু সেটা বোঝার চেষ্টা করা এবং কৃষকের পাশে দাঁড়ানোটা ভীষণ জরুরি, এবারের হাইব্রিড ঝলকের বিপর্যয়ে কয়েক হাজার টন ধান কম উৎপাদনের ঘটনা সেই বার্তাই জানিয়ে যাচ্ছে।

লেখক: গবেষক ও রাজনৈতিক কর্মী। এ নিবন্ধটি ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ সাইট ফেসবুকে প্রকাশ হয়েছে।

বীজ নিয়ে প্রতারণা দিশেহারা কৃষক

আলতাব হোসেন

ঝলক ও সিনজেনটাসহ একাধিক কোম্পানির হাইব্রিড ধান, ভুট্টা ও টমেটো চাষ করে দেশের প্রায় দেড় লাখ কৃষক এখন দিশেহারা। ঝলক ধান চাষ করে প্রায় ৩০ হাজার হেক্টর জমির ফসল পুরোপুরি এবং পাঁচ হাজার হেক্টর জমির ফসল আংশিক নষ্ট হয়েছে বলে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ জানিয়েছে। ৩ লাখ টন খাদ্যশস্য কম উৎপাদন হওয়ার আশঙ্কা করছে কৃষি বিভাগ। চলতি মৌসুমে সিলেট, সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চুয়াডাঙ্গা ও কুমিল্লা অঞ্চলে এমন বিপর্যয় দেখা দেয়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ জামালপুর, টাঙ্গাইল, নওগাঁ, চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী ও বরেন্দ্র অঞ্চলে সিনজেনটার ভুট্টা ও টমেটো বীজ আবাদ করেও কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১০ এপ্রিল সার্ক বীজমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভেজাল বীজ বিক্রেতাদের সাবধান করে দেন। তিনি বলেন, কৃষককের সর্বনাশ করা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও বীজ উইংয়ের মহাপরিচালক আনোয়ার ফারুক বলেন, এরই মধ্যে সারাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা নমুনা সংগ্রহে নিয়োজিত আছেন। গবেষণার পর অভিযোগের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয় থেকেও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বীজ নিয়ে প্রতারণার ঘটনা বেড়েই চলেছে। চড়া দামে বীজ কিনে কাঙ্খিত ফলন পাওয়া যাচ্ছে না। যেসব জমিতে এসব কোম্পানির বীজ রোপণ করা হচ্ছে সেসব জমির ফসলে বিভিন্ন পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দিচ্ছে। বাধ্য হয়ে কৃষককে একই কোম্পানির কীটনাশক ও মিশ্র সার ব্যবহার করতে হচ্ছে। পোকার আক্রমণে ফলনও কম

হচ্ছে। অনেক সময় পুরো ফসলই নষ্ট হয়। এভাবে বীজ কোম্পানির কাছে জিম্মি হয়ে পড়ছেন কৃষক। কোম্পানিগুলো সারাদেশে নিজস্ব ডিলারের মাধ্যমে বীজ বিক্রি করলেও কৃষকদের কোনো ক্যাশ মেমো দেয় না। ফলে কোনো কোম্পানির বীজ কিনে কৃষক প্রতারিত হলে সেই কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারেন না কৃষক। এছাড়া গ্রামের হাট-বাজারে বীজের প্যাকেটের গায়ে কোম্পানির নাম-ঠিকানাও থাকে না। অনেক সময় কোম্পানির নাম-ঠিকানাসহ প্যাকেটের বীজ থেকে ফসল উৎপাদন না হলে ওই কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে, ওই কোম্পানি তখন তাদের প্যাকেট নকল করে ভুয়া কোম্পানির বীজ বিক্রি করা হয়েছে বলে এড়িয়ে যায়। বিভিন্ন মাধ্যমে চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে কৃষকদের কাছে কীটনাশক বিক্রি করছে কোম্পানিগুলো। দু'বছর ধরে এরকম হাইব্রিড বীজে বিএলএস ও বিএলবি রোগ দেখা দিয়েছে।

নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার কেশারখিল গ্রামের কৃষক আবুল কাশেম জানান, তার ১০ গন্ডা জমিতে লাগানো ঝলক বীজের ধানের শীষ শুকিয়ে গেছে। কীটনাশক দিয়েও ফল পাননি। তিনি বলেন, 'গত বছরও ২০ মণ ধান পেয়েছিলাম; এবার ২০ কেজি ধানের আশাও নেই। 'নোয়াখালী জেলার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা রুহুল আমিন জানান, ঝলক বীজ রোপণ করা আমিশাপাড়া ইউনিয়নের ৫০ হেক্টর জমির ফসল আক্রান্ত হয়েছে। বেগমগঞ্জ উপজেলার আলাদী গ্রামের আবুল হোসেন চৌধুরী জানান, তারা দু'ভাই মিলে ৪ একর ৬০ শতাংশ জমিতে ঝলক ধানের চাষ করেন। শীষ আসার দু'দিনের মধ্যে পুরো জমির ধান শুকিয়ে যায়। তিনি বলেন, 'গরু মারা যেতে পারে এমন আশঙ্কায় খড়ও গরুকে খাওয়াতে পারছি না।'

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) বীজ বিভাগের উপ-পরিচালক রুহুল আমিন বলেন, কৃষকের ক্ষতির দায় ঝলক বীজ বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান এনার্জিপ্যাক বীজ কোম্পানির। রসিদ না দেওয়ায় বীজ কোম্পানি দায় এড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে বলে মনে করেন রুহুল আমিন। বিএডিসির নোয়াখালী জেলা বীজ ও সার ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সাহাব উল্যা রসিদ ছাড়া বীজ বিক্রির বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, রসিদ দিয়ে কেন দায়দায়িত্ব নিজের ওপর নেব। এনার্জিপ্যাক এগ্রো লিমিটেডের কুমিল্লা জোনের উৎপাদন ব্যবস্থাপক আবদুল হামিদ ঝলক বীজের ফলন বিপর্যয়ের কথা স্বীকার করেন। কোম্পানির ভাইস চেয়ারম্যান ড. নাসিম আহম্মেদ বলেন, কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ পাবেন।

বাংলাদেশ সিড অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক মাহবুব আনাম বলেন, ঝলকের বিষয়ে অ্যাসোসিয়েশনেও একাধিক অভিযোগ এসেছে। ঝলক কর্তৃপক্ষ তাকে জানিয়েছে, শুধু কুমিল্লা ও সিলেটে সমস্যা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে বিষয়টির

সমাধান করা হবে বলেও তাকে অবহিত করা হয়েছে।

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার সাগরপাড়া গ্রামের জিয়াউর রহমান জানান, তিনি চলতি মৌসুমে ৪৫ বিঘা জমিতে সিনজেনটার হাইব্রিড সবল জাতের টমেটো চাষ করে সর্বস্ব হারিয়েছেন। গোদাগাড়ী উপজেলার প্রায় ১৫ হাজার কৃষক সিনজেনটার বীজ প্রতারণার শিকার হয়েছেন। এরই মধ্যে তারা সিনজেনটার বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা করেছেন। চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার কৃষক মোহাম্মদ আলী সিনজেনটার হাইব্রিড জাতের ভুট্টা আবাদ করে প্রতারণার শিকার হয়েছেন। তিনি জানান, তার এলাকায় অন্তত ৩০০ কৃষক সিনজেনটার ভুট্টা চাষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তবে কয়েকজন কৃষককে ৭ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দিয়েছে সিনজেনটা। যদিও এসব কৃষকের ক্ষতি হয়েছে লাখ টাকার ওপরে।

কৃষি মন্ত্রণালয় দেশের মোট বীজ চাহিদার ২২ ভাগ সরবরাহ করে থাকে বলে দাবি করলেও বেসরকারি বীজ কোম্পানিগুলোর এক গবেষণায় তা ১১ ভাগ বলে দাবি করা হয়েছে। বাংলাদেশ সিড অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক মাহবুব আনাম বলেন, নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের বীজ ব্যবসায়ীদের জরিমানা, লাইসেন্স বাতিল ও দোকান বন্ধ রাখার একটা নীতি করা হয়েছে। তবে নকল বীজ বন্ধে সরকারের মনিটরিং বাড়ানো দরকার বলে তিনি মত দেন।

কৃষি ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ বলেন, কৃষকের পক্ষে নীতিমালা নেই। বীজ কিনে বা অন্য কোনো কারণে ফসল নষ্ট হলে কৃষক ক্ষতিপূরণ পান না। ফসলের ক্ষতি হলে কৃষক যেন শস্যবীমার সুযোগ পান সে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

লেখক: দৈনিক সমকালের সিনিয়র রিপোর্টার ও বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিপোর্টারস্ ফোরামের সভাপতি। এ প্রতিবেদনটি ২৭ এপ্রিল ২০১১ দৈনিক সমকালে প্রকাশিত হয়।
http://www.samakal.com.bd/details.php?news=14&view=archiev&y=2011&m=04&d=27&action=main&menu_type=&option=single&news_id=151858&pub_no=675&type=

কৃষক কি ক্ষতিপূরণ পাবে না?

শরীফুজ্জামান শরিফ, জীবনানন্দ জয়ন্ত ও নুরুল আলম মাসুদ

গত মৌসুমে নোয়াখালী অঞ্চলে ঝলক-১ হাইব্রিড ধান এবং রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় সবল এফ-১ হাইব্রিড জাতের টমেটো বীজ চাষ করে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কিন্তু এই ক্ষতির জন্য দায়ী কোম্পানি দুটির বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি; কৃষকরাও পাননি ক্ষতিপূরণ। কোম্পানি কিংবা কৃষি উন্নয়নে নিয়োজিত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থাপনা- এমনকি সরকারের দায়িত্বশীল কোনো অবস্থান থেকেই কৃষকের ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনায় আসেনি।

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় প্রচুর টমেটো ফলে। এখানকার কৃষকদের প্রধান অর্থকরী ফসল এটি। প্রতি মৌসুমের আয় থেকে কৃষক, বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষক তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রিক পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ করে থাকেন। কিন্তু ২০১০ সালে সেখানকার কৃষকরা একটি বহুজাতিক বীজ কোম্পানির কর্তৃক ভারত থেকে আমদানিকৃত 'সবল এফ-১' হাইব্রিড জাতের টমেটো বীজ কোম্পানির নিজস্ব পরিবেশক ও তাদের মনোনীত বিক্রেতার কাছ থেকে চড়ামূল্যে সংগ্রহের পর চাষ করে কোনো ফলন পাননি। অপরদিকে এনার্জি প্যাক এগ্রো লিমিটেড কোম্পানির চীন থেকে আমদানিকৃত 'ঝলক-১' হাইব্রিড ধানের বীজ চাষ করেও কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ঝলক বীজ আমদানিকারক কর্তৃপক্ষ এর আগেও কৃষকের সঙ্গে প্রতারণা করেছিল এবং এ নিয়ে একটি দৈনিক পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। জানা যায়, এই কোম্পানি ২০১০ সালে 'এগ্রোজি-১' নামে আমদানিকৃত যে বীজ বাজারে ছাড়ে তাতে হবিগঞ্জের কৃষকরা কোনো ফলন পাননি। এ বছর নাম পরিবর্তন করে ঝলক-১ নামে বীজটি বাজারে ছাড়া হয় এবং এবারও দেশের বিভিন্ন স্থানে চাষ করে কৃষকরা প্রতারিত হয়েছেন। জাতীয় বীজ নিবন্ধন

কর্তৃপক্ষ নিবন্ধিত এই বীজ ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলের জন্য নিবন্ধিত হলেও এটি নোয়াখালী-লক্ষ্মীপুরসহ সারাদেশেই বিক্রি করা হয়।

দুটি ঘটনার পরই প্রান্তিক ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা ক্ষতিপূরণের দাবিতে রাস্তায় নেমে আসেন, তারা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সমাবেশ করে প্রধানমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতরের প্রধানদের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। জাতীয় সংসদে রাজশাহী-১ আসনের সাংসদ ভেজাল ও নিম্নমানের টমেটো বীজের বিষয়টি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু এরপরও কৃষক ক্ষতিপূরণ পাননি, শাস্তি হয়নি কোম্পানি দুটি'র কারোরই। আমরা মর্মাহত, কৃষি অর্থনীতির বাংলাদেশে কৃষকের সঙ্গে প্রতারণা করে কোম্পানিগুলো বহাল তবিয়তে মুনাফা লুটে নেয় আর কৃষককে দাবি আদায়ে রাস্তায় গড়াগড়ি খেতে হয়! প্রায় আড়াই হাজার টমেটো চাষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং রাজশাহী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির ফিল্ড অফিসের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৪ হাজার হেক্টর জমির টমেটোর ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে কৃষক যখন মরিয়া, সবল এফ-১ টমেটো বীজ প্রত্যাখ্যানে যখন সরব তখন রাজশাহীতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির দালাল-চাপরাশিরা সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তার সঙ্গে গোপন যোগাযোগ করছে তাদের ব্যবসা চালু রাখতে। এখানেই শেষ নয়, রাতের আঁধারে গোদাগাড়ীর বিভিন্ন এলাকার অভাবক্লিষ্ট চাষিদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে তাদের দাবি আদায়ের আন্দোলন থেকে সরানোর চেষ্টা করছে। এ ধরনের কাজ কৃষক সম্প্রদায়ের মাঝে বংশ পরম্পরায় যে সম্পর্ক ও বিশ্বাস বিদ্যমান সেখানে অবিশ্বাসের বীজ রোপণ করছে, যা পরে কৃষকদের স্ববিরোধী মনো-সামাজিক দ্বন্দ্বে ফেলবে এবং স্থায়ীভাবে কৃষি ও কৃষক সুরক্ষায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

বাংলাদেশের বীজনীতিতে বীজ খাতের বাণিজ্যিকীকরণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কৃষি ও কৃষক সুরক্ষার বিষয়টি অবহেলিত থেকে গেছে। ফলে এ ধরনের ক্ষতিগ্রস্ততার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকের কল্যাণে ভূমিকা রাখার মতো সুযোগ দৃশ্যমান নয়। আবার কৃষিনীতিতে বর্ণিত সম্প্রসারণ কর্মীদের দায়িত্বশীলতা যে ক্ষেত্রে চিহ্নিত রয়েছে তাও স্বাভাবিকভাবে দৃশ্যমান নয়। এছাড়া ভেজাল ও নিম্নমানের বীজ চাষে কৃষকরা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তার পেছনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ ভূমিকা পালন না করার বিষয়টিও ক্রিয়াশীল। এখানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, স্থানীয় বীজ-সার মনিটরিং কমিটি তাদের দায় এড়াতে পারে না। এ রকম অবস্থায় দেশজ অর্থনীতির প্রাণ সঞ্চারকারী কৃষককুল নিরাপত্তাবলয় থেকে অযুত মাইল দূরেই থেকে যাচ্ছে। এ রকম অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

কৃষি ও কৃষক সুরক্ষায় আমদানিকারক দেশি-বিদেশি কোম্পানিগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আমদানিকৃত বীজের গুণগতমান নিশ্চিত করা সময়ের দাবি। আমরা চাই

কৃষি এবং কৃষককে সুরক্ষা দিতে প্রয়োজনীয় সব কর্মসূচি সরকারিভাবে গৃহীত হোক।

এ যাবৎকালে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের ক্ষতির বিষয়টি জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং ক্ষতিপূরণের বিষয়টি বিদ্যমান নীতি ও আইনে যুক্ত করা; উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ পদ্ধতি সব ফসল/উদ্ভিদ ও জাতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ বাধ্যতামূলক; কৃষি সম্প্রসারণ, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি; প্রতারক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক অনুমোদন বাতিল এবং দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান; কৃষকবান্ধব বীজনীতি-আইন প্রণয়ন; দেশে উন্নতমানের বীজ উৎপাদনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিএডিসির কার্যক্রম সম্প্রসারণ; বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি শক্তিশালীকরণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরালোভাবে মনিটর করা; বীজ আমদানি ও বিপণন ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নিয়ম অনুসরণ অন্যথায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেওয়া হোক। বর্তমান সরকার তাদের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং এ রূপকল্পে কৃষি এবং কৃষককে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আমাদের কৃষকও সেদিকেই তাকিয়ে আছেন- তারা ভেজাল বীজ আমদানি বন্ধ করা এবং ভেজাল বীজ ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত চাষীরা যেন ক্ষতিপূরণ পায় তারজন্য বিভিন্ন নীতি কাঠামো গড়ে তোলার মধ্যদিয়ে 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের অঙ্গীকার পূরণ করবে।

লেখকবৃন্দ নাগরিক অধিকারকর্মী। নিবন্ধটি ৫ আগস্ট ২০১১ দৈনিক সমকালে প্রকাশিত হয়। http://www.samakal.com.bd/details.php?news=20&view=archiev&y=2011&m=08&d=05&action=main&menu_type=&option=single&news_id=179271&pub_no=773&type=

চীন থেকে আসা ঝলক ধান, চিনচিনে ব্যথায় কৃষক

মোশাহিদা সুলতানা ঋতু

ঝলক ধানের মত অনেক হাইব্রিড ধানের আবাদ নষ্ট হওয়ার খবর মাঝে মাঝে ঝলক দেয় আমাদের গণমাধ্যমগুলোতে। তারপর হারিয়ে যায় বাম্পার ফলনের খবরের স্রোতে। এইসব খবর পত্রিকা পাঠক বা টিভির দর্শকরা এক ঝলক পড়েন বা শোনেন। তারপর হন বিস্মৃত । সরকারও সাধারণত এই বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থাকে। এর কারণ কী জিজ্ঞেস করলে একটা গৎ বাঁধা উত্তর পাওয়া যায় সরকারের কাছে । উত্তরটি হলো এই ক্ষতি তো পুরো দেশের ধানের ফলনের এক শতাংশেরও নীচে। এটা নিয়ে এত লাফালাফির কী আছে। অর্থাৎ ক্ষতির পরিমাণ অনুপাতে এর গুরুত্ব এই দেশের জনগণের কাছে এত কম যে এটা নিয়ে কথা না বললেও চলে। জনগণ তো খাবার পাচ্ছেই । তাহলে আর চিন্তা কী? এই বছরও বৈশাখের শুরুতে দেখা গেছে নোয়াখালী এলাকায় প্রায় ১ হাজার ৬৬৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১ হাজার ১৩৭ হেক্টর জমির ঝলক ধান নষ্ট হয়েছে। গোপালগঞ্জ এলাকায় ৩৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ৫০ হেক্টর জমির ঝলক ধান সম্পূর্ণভাবে এবং ১২০ হেক্টর জমির ধান আংশিকভাবে নষ্ট হয়েছে। এছাড়াও চলতি মৌসুমে সিলেট, ময়মনসিংহ, চুয়াডাঙ্গা, জামালপুর, নেত্রকোনা, কুমিল্লা অঞ্চলেও বিচ্ছিন্নভাবে ঝলক ধানের ফলনে বিপর্যয়ের খবর পাওয়া গেছে। এই পুরো বিপর্যয়ে ক্ষতি হয়েছে ১০ হাজারেরও বেশি কৃষকের। যদি দশ হাজার না হয়ে এক হাজার কৃষকও হতো বা দশ জন কৃষকও হতো তাতেও কী কৃষকের এই বিপর্যয়ের কারণ ও পরিণতিকে অস্বীকার করে সরকারের দায়মুক্তিকে মেনে নেয়া যায়?

ক্ষতির কারণ: বীজবাহিত রোগ না আবহাওয়া?

বীজ বিক্রেতা এনার্জিপ্যাক এগ্রো লিমিটেড ঝলক ধানের এই বিপর্যয়ের পিছনে

প্রাথমিকভাবে কারণ হিসেবে দায়ী করেছিল আবহাওয়ার তারতম্যকে। বলা হয়েছিল উপকূলীয় অঞ্চলে ভোর রাতে শিশির পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ধান গাছ। আবার এটাও বলা হয়েছিল যে অতিরিক্ত সার ব্যাবহার ও প্রয়োজনীয় দূরত্ব না রেখে ধান গাছ লাগানোর কারণে এই বিপর্যয় ঘটেছে। সাধারণত এই প্রত্যেকটি কারণ যেকোনো বিপর্যয়ের পর শোনা যায়। প্রাথমিক গবেষণায় এই কারণগুলিকে দায়ী করা হলেও পরবর্তীতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা থেকে গণমাধ্যমগুলিতে প্রচার করা হয়েছে যে ঝলক ধানের বীজটি মূলত ২৫-২৮ ডিগ্রি তাপমাত্রা সহনশীল। কিন্তু এ বছর বোরোর ভরা মৌসুমে দীর্ঘদিন ১৭ থেকে ২৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা ছিল। গবেষণা ফল অনুযায়ী মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও হালকা বাতাসযুক্ত স্বল্প তাপমাত্রা ব্লাস্ট রোগ বিস্তারে সাহায্য করেছে। সাধারণভাবে দেখলে বিজ্ঞানীদের গবেষণার এই ফল গ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে কয়েকটি বিষয় এখানে অমীমাংসিত ও অপরিপূর্ণ থেকে যায় ।

প্রথমত প্রশ্ন করা যেতে পারে "তাপমাত্রার সহনশীলতার ব্যাপ্তি মাত্র ৪ ডিগ্রি অর্থাৎ ২৫-২৮ ডিগ্রির মধ্যে হয় কী করে?" এক মাসের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই তো এর চাইতে বেশি তাপমাত্রা ওঠানামা করার কথা। দ্বিতীয়ত পাশাপাশি জমিতে যখন ঝলক, ব্রি ১৮ এবং হীরা একই সাথে হয় তখন ছত্রাক কেন শুধু ঝলকের ক্ষতি করে অথচ পাশের জমিতেই কেন ধানের বাম্পার ফলন হয়? এর থেকে কী অনুমান করা যায় না যে ঝলকের রোগ বীজবাহিত? তৃতীয়ত, ঝলকের চাষ শুধু নোয়াখালীতে নয়, গোপালগঞ্জ, সিলেট, ময়মনসিংহ, চুয়াডাঙ্গা, জামালপুর, নেত্রকোনা, কুমিল্লা অঞ্চলেও হয় এবং এইসব অঞ্চলেও বিচ্ছিন্নভাবে ঝলক ধানের বিপর্যয়ের খবর পাওয়া গেছে। এই বিচ্ছিন্নভাবে হওয়া ক্ষতি থেকে কী ধারণা করা যায় না যে রোগটি বীজবাহিত? এবং এর দায় কৃষকের বা শুধু আবহাওয়ার নয় বরং যারা এই বীজ বাজারজাত করেছে তাদের এবং যারা এই বীজ বিক্রির অনুমতি দিয়েছে অর্থাৎ সরকারেরও? সব শেষে আরেকটি প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায় আর তা হলো ছত্রাকের আক্রমণ রোধ করতে ওষুধ ব্যবহারের পরও কোনো ফল কেন পাওয়া যায়নি? কৃষকেরা ছত্রাক আক্রমণের সাথে পরিচিত এবং এর প্রতিকারের উপায়ও তাদের অজানা নয়। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের উপদেশ নিয়ে কৃষকেরা রোগ প্রতিষেধক ব্যবহার করেও কেন ফল পেল না? সরকারের কি উচিত ছিল না এই প্রশ্নগুলির খোলাখুলি জবাবদিহিতা করা? এই সব অসামঞ্জস্যের জবাদিহিতা ছাড়া গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতাই বা কে নির্ধারণ করে?

ক্ষতিপূরণ: কৃষকদের ভাষ্য ও কোম্পানির দায়বদ্ধতা

মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সাক্ষাতকার নিয়ে জানা গেছে যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গবেষণা দল ধানের আলামত সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে কৃষকদের কাছ থেকে অথচ কৃষকদের কাছে

গবেষণার ফল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার করেনি। বেশিরভাগ কৃষক এখনো গবেষণার ফল সম্পর্কে অবহিত নন। যেই কৃষকেরা ফসলের মালিক, যারা এত বড় ক্ষতির বোঝা মাথায় বহন করছে, গবেষণার ফল তাদের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছায়নি। তাহলে এই গবেষণা ফল আসলে কাদের জন্য? এই সব প্রশ্নের উত্তর ছাড়া ঢালাওভাবে আবহাওয়াকে দায়ী করে কৃষকের দাবিকে উড়িয়ে দেয়া কৃষকের প্রতি অন্যায় ।

গত বছর যেই অঞ্চলগুলিতে একই ঝলক ধান লাগিয়ে বাম্পার ফলন হয়েছে সেই ধান এই বছর ব্যাপক আকারে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কৃষকদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এদিকে হাজার হাজার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক এর মধ্যে রাস্তায় নেমেছে, ক্ষতিপূরণ দাবি করে মানববন্ধন করেছে, চিটা ধান পুড়িয়ে জানিয়েছে বিক্ষোভ। কিন্তু তারপরও এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো জোরালো পদক্ষেপ নেয়নি সরকার। ঝলক ধানের ক্ষতিপূরণ নিয়ে প্রথম দিকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছিল বীজ বিক্রেতা এর্নাজিপ্যাক। কিন্তু এখন বীজ বিক্রেতারা ঝামেলাহীনই আছে। প্রথম দিকে খবরের কাগজের লোকদের দেখলে এনার্জিপ্যাক এগ্রো লিমিটেড বলেছে কোম্পানির বীজের কারণে ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ তারা দিবে। কৃষকদের সাথে আলাপে জানা যায় বীজের প্যাকেট থেকে ফোন নাম্বার সংগ্রহ করে ফোন করলে কোনো কৃষকের পরিচয় শুনলেই বীজ বিক্রেতা এনার্জিপ্যাক ফোন রেখে দেয়। কৃষকেরাও খরচের ভয়ে হানা দেয় না বীজ বিক্রেতা কোম্পানির দরজায়। কাজেই এনার্জিপ্যাক এগ্রো লিমিটেড নিশ্চিন্তে আছে। এদিকে কৃষকেরা চরম দুঃখে কান্নাও ভুলে গেছে।

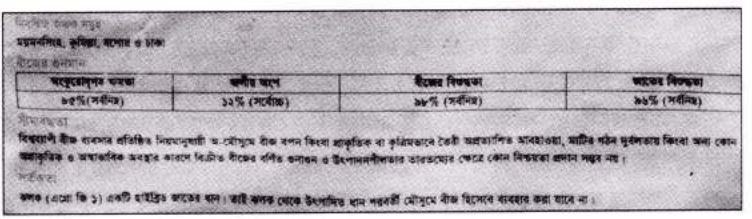

নোয়াখালীর এক কৃষক সর্বস্ব হারিয়ে হাসতে হাসতে বলছেন "মানববন্ধন বদ্দরলোকের কাম। মানববন্ধন কইরলে সরকার মনে করে হ্যাতাগো শীত লাগে, হেইজন্য রোদ পোয়ায়?। মানববন্ধন কইরা কাম নাই, রাস্তা অবরোদ কইরতে অইব।"

ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও ঢাকা

অংকুরোদগম ক্ষমতা	জলীয় অংশ	বীজের বিশুদ্ধতা	জাতের বিশুদ্ধতা
৮৫%(সর্বনিম্ন)	১২% (সর্বোচ্চ)	৯৮% (সর্বনিম্ন)	৯৬% (সর্বনিম্ন)

ঝলক (এগ্রো জি ১) একটি হাইব্রিড জাতের ধান। তাই ঝলক থেকে উৎপাদিত ধান পরবর্তী মৌসুমে বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

বীজের প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে ''সীমাবদ্ধতা- বিশ্বব্যাপী বীজ ব্যবসার প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুযায়ী অ-মৌসুমে বীজ বপন কিংবা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিমভাবে তৈরি অপ্রত্যাশিত আবহাওয়া, মাটির গঠন দুর্বলতায় কিংবা অন্য কোন অপ্রাকৃতিক ও অস্বাভাবিক অবস্থার কারণে বিক্রীত বীজের বর্ণিত গুনাগুন ও উৎপাদনশীলতার তারতম্যের ক্ষেত্রে কোন নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভব নয়।"। অর্থাৎ গবেষণায় যদি দেখানো যায় যে ক্ষতির কারণ

বীজবাহিত রোগ নয়, বরং আবহাওয়া, তাহলে কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিতে দায়বদ্ধ নয়। গবেষণার ফল সেই অর্থে কোম্পানির পক্ষেই যায়। কার সাধ্য আছে এই গবেষণাকে চ্যালেঞ্জ করে ?

প্রথমত কৃষকদের যেখানে জানানোই হয়নি যে গবেষণায় ফসল নষ্টের কারণ কী; সেখানে কৃষকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কোনো গবেষণালব্ধ ফলের সত্যতা কীভাবে যাচাই করা সম্ভব? গবেষণা ফলে বলা হয়েছে ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হওয়ার কথা। কিন্তু এই ব্লাস্ট রোগ যে বীজবাহিত হতে পারে সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো মন্তব্য পত্রিকায় আসেনি। কৃষকদের মতে ব্লাস্ট রোগটি বীজবাহিত এবং এর যথেষ্ট প্রমাণও তাদের কাছে রয়েছে। কিন্তু এই বিষয়ে কৃষকদের কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য কোথাও প্রচার করা হয়নি। অর্থাৎ যেই কৃষক যুগ যুগ ধরে ফসল ফলাচ্ছেন, গবেষকের গবেষণার বিপরীতে সেই কৃষকের বক্তব্যকে এখানে গৌণ ধরা হয়েছে। এই অবস্থায় কোম্পানি যদি নিজেদের দায় মুক্ত মনে করেন কিন্তু কৃষক যদি সেই গবেষণা ফলকে গ্রহণ না করে তাহলে এই বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে।

জাতীয় বীজ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ঢাকা, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে ঝলক ধানের বীজ বিক্রির নিবন্ধন দিলেও এই ধান নোয়াখালী ও লক্ষীপুরসহ সারা দেশে বিক্রি করা হয়। কৃষক বীজ কেনার আগে এই বিষয়ে তাকে অবহিত করা হয়নি। বরং অনেক জায়গায় শোনা গেছে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তারা অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাই কৃষকদের এই বীজ কিনতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। শুধু তাই নয় কৃষকরা জানিয়েছে যে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে মহিলা মডেল দিয়ে বিজ্ঞাপন চিত্রায়িত করে লোকাল প্রাইভেট টিভি চ্যানেলে প্রচার করে কৃষকদের এই বীজ কিনতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। প্যাকেটের গায়ে কোথাও লেখা নেই যে এই ধান শুধু ২৫-২৮ ডিগ্রি তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে, এর বাইরে পারে না। বীজ কেনার সময় কৃষকের অধিকার আছে তাপমাত্রা সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা। না জানিয়ে বীজ বিক্রি করার অনুমতি যদি দিয়ে থাকে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি তাহলে এর দায় বহন করতে হবে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিকেও। শুধু তাই নয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও স্থানীয় বীজ-সার মনিটরিং কমিটিরও এই বিষয়ে দায়বদ্ধতা রয়েছে। শুধু গবেষণা ফলের ওপর ভিত্তি করে দায় মুক্তির যে কৌশল প্রচলিত আছে তা কৃষকবান্ধব নয়। বীজনীতিতে কৃষকবান্ধব শব্দটির মানে কী সেটা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং কৃষকের ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করার পদ্ধতি এবং কোম্পানির ক্ষতিপূরণের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে কৃষকের সম্মতি থাকতে হবে ।

বীজনীতি: বীজ বাণিজ্যিকীকরণ ও সরকারের ভূমিকা

এবার দেখা যাক ঝলক ধান নিয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনার সাথে বীজনীতিতে উল্লেখিত

সরকারের ভূমিকা কতটুকু প্রাসঙ্গিক। প্রথমত কেউ যদি মনে করেন ঝলক ধানের বিপর্যয়ের বিষয়টি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা তবে তার ভুল ভাঙার জন্য দেখতে হবে বীজনীতিতে কী আছে। বীজনীতি সম্পূর্ণভাবে বীজ বাণিজ্যিকীকরণের পক্ষে একটি দলিল। বীজনীতি থেকে নেয়া নিম্নে উল্লেখিত কয়েকটি অংশ বাণিজ্যিকীকরণের পক্ষেই সরকারের অবস্থানকে পরিষ্কার করে।

১১.২.২ ভূমিকা এবং কার্যাবলী ঃ

অন্যান্য কাজের মধ্যে বীজ উইং এর কতিপয় ভূমিকা ও কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

(খ) বেসরকারী খাতের সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অন্যান্য বীজ উৎপাদন। যে সকল বীজ বেসরকারী খাতে উৎপাদিত হচ্ছে সেগুলির উৎপাদন থেকে বিএডিসি ধীরে ধীরে সরে আসবে।

(গ) বেসরকারী খাতে বীজ শিল্প উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বীজ উইং কারিগরী সহযোগীতা এবং অন্যান্য সহায়তা/ সেবা প্রদান করবে।

১১.২.৫ বিপনন ঃ

উপজেলা পর্যায়ে বিএডিসির বীজ বিক্রয়কেন্দ্রগুলো ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করে বেসরকারী বীজ ডিলারগণকে সেস্থলে নিয়োজিত করা হবে। আঞ্চলিক এবং ট্রানজিট বীজ কেন্দ্রগুলো বেসরকারী খাতের উত্তোলনস্থান হিসাবে নির্দিষ্ট করে উন্নয়ন করা হবে।

ঝলক ধানের ঘটনাটি হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়। বীজের বাণিজ্যিকীকরণ ও উদারীকরণ এই পরিণতিই দাবি করে। শুধু বাংলাদেশেই নয় বিশ্বের বহুদেশ বীজ বাণিজ্যিকীকরণের মধ্যদিয়ে এই পরিস্থিতির শিকার। ঝলক ধানের ঘটনাটি আমাদেরকে আবারও স্মরণ করিয়ে দেয় যে এই বাণিজ্যিকীকরণের ফলে বীজ বিক্রেতা চড়া দামে বীজ বিক্রি করে লাভ করলেও ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয় ক্ষুদ্র কৃষকদেরই। কখনো কখনো এ ধরনের বিপর্যয়ের পরে দেখা যায় আসল বীজ বিক্রেতার নাম দিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা নিম্নমানের বীজ বিক্রি করে কৃষকের সীমাহীন ক্ষতি করে।

আমাদের দেশে এই ধরনের অসাধু ব্যবসায়ীদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করা বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। সিনজেনটার নামে টমেটো বীজ বিক্রি করে অসাধু ব্যবসায়ীরা লাভ করে কৃষকের ক্ষতি করলেও এর দায়ভার সিনজেনটাও নেয়নি, নেয়নি ব্যবসায়ীরাও। ব্যবসায় বাজারমুখী মনোভাব ও কর্তব্যহীন বিপণন ব্যবস্থার দায় কাউকেই বইতে হয় না। বইতে হয় কৃষকদের।

আমাদের দেশে ঝলক ধানের ক্ষতি সর্বমোট উৎপাদিত ধানের তুলনায় সামান্য বলে এই বিষয়টির ওপর যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু এই ধানের ক্ষতি যদি আমাদের উৎপাদিত ধানের একটি বড় অংশ কখনো হয় তার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি কি আমাদের আছে? ঝলক ধানের ক্ষতির কারণ প্রকাশে গাফিলতি, ক্ষতিপূরণ নিয়ে মিথ্যা আশ্বাস, এবং বীজ বিক্রেতাদের উদাসীনতা এই সব কিছু আভাস দেয় যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার

কথা বললেও এর বাস্তবায়ন কখনই হয় না। কখনো কখনো পরবর্তী বছরে বিনামূল্যে বীজ বিতরণ করে এই ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে বীজ বিক্রেতারা। বাজারমুখি ব্যবস্থায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই ধরনের মীমাংসা সরকার নিয়ন্ত্রিত হয় না বলে সব চাইতে ক্ষুদ্র ও দরিদ্র কৃষকেরা এর ফল ভোগ করে। আমরা চাই সরকার এই বীজ বিক্রেতাদের বাজারীকরণ, বিতরণ, ক্ষতিপূরণ আদায় ও সর্বোপরি গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করুক। অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিকীকরণ যেন আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত না করে সেই বিষয়ে জনগণকেও সোচ্চার হতে হবে।

যে খাদ্য নিরাপত্তার অজুহাতে হাইব্রিড ধানের ফলনকে সরকার বাজারে বিপণনের অনুমতি দিয়েছে, বীজের বাণিজ্যিকীরণের স্বার্থে বাজার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, সেই একই অজুহাতে হলেও সরকারের কর্তব্য কৃষকের স্বার্থ নিশ্চিত করা। কিন্তু সরকার যদি এই বিষয়ে নির্বিকার থাকে এবং বাজার অর্থনীতির সংকট মুহূর্তে পরিত্রাণদাতার বদলে পরিব্রাজকের ভূমিকা পালন করে তাহলে এই উন্মুক্ত বীজের বাজারের ভয়াবহ পরিণতি একদিন না একদিন সরকারকেই বহন করতে হবে ।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্টের অর্থনীতির প্রভাষক। *প্রবন্ধটি ৯ আগস্ট ২০১১ বিডিনিউজ২৪.কম-এ প্রকাশিত হয়।*

ঝলক : সরকার কার পক্ষে বীজ কোম্পানি না কৃষকের

মাহমুদল হাসান রুদ্র মাসুদ

খাদ্য ঘাটতি (?) উৎপাদন বাড়ানোর দায় কৃষকের। সারের দাবি করলে প্রাণও দিতে হবে কৃষককেই। আর্থিক সংকটের কথা বলে কাঁটছাঁট নামের কাঁচিটিও চলে কৃষকের ভর্তুকির ওপর। ক্ষমতার রাজনীতি আর ভোটের বাজারেও কৃষকের কদর কম নয়। একটু আগ বাড়িয়ে, বর্তমান সরকার আবার নিজেদের কৃষকবান্ধব সরকার বলে দাবি করে। কৃষকের জন্য কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত জিগির তোলার প্রবণতাও নতুন কিছু নয়। কিন্তু কৃষক আর কৃষি নিয়ে বাজারের মানদন্ডে সরকারের অবস্থান বণিকের না কৃষকের পক্ষে সেই প্রশ্ন ইতোপূর্বে উঠেছে বলে মনে পড়ে না। প্রশ্নটি উঠেছে 'সফল কৃষিমন্ত্রী' আর 'কৃষকবান্ধব' সরকারের জামানায়। চিরায়ত নিয়ম অনুযায়ী সরকার হয়তো এই প্রশ্নের জবাব দিবে না; তবে আমাদের কৃষক সমাজ ঠিকই এ প্রশ্নটির জবাব জানেন। হাইব্রিড ধান 'ঝলকের' বীজ বিপর্যয়ের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি, সরকার আসলেই বণিজের পক্ষে।

সরকার টাকা দিয়েও জনগণের জন্য খাদ্য কিনতে পারেনি, এটি বেশি দিনের ঘটনা নয়। তদারকি সরকারের সময়ে সারাদেশে ডিজেল ভর্তুকির টাকা বিতরণ, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর কৃষকের মাঝে বিশেষ কার্ড প্রদান, ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খুলে সেখানে ভর্তুকির টাকা পৌঁছে দেওয়াসহ আরো কত্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এসব কিছুরই মূল হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো। আমাদের নিজস্ব জাত, এমনকি দেশের কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নানান উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান বীজ বাদ দিয়ে বিদেশ থেকে বহুজাতিক কোম্পানি মাধ্যমে হাইব্রিড জাতের বীজ নিয়ে আসা হয় উৎপাদন বাড়ানোর নাম করে। সরকারের রাতারাতি উৎপাদন বাড়ানোর তৎপরতায় মওকা পেয়ে যায় বীজ বেনিয়ারা। বেশ ক'বছর ধরেই দেশের বড় বড় গ্রুপ অব কোম্পানিগুলো বীজের ব্যবসা

ব্যবসা চালিয়ে আসছে। তাদের হাত ধরেই এ বছর 'ঝলক' নামে আরেকটি বীজ বাজারে আসে। নানান অর্জন থাকলেও একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়- আমরা হুজুগে বাঙালী। সেই হুজুগকে কাজে লাগিয়ে রমরমা ব্যবসার ফাঁদ পেতেছে বীজ কোম্পানিগুলো। এখানে সাধারণ কৃষক কিংবা জনগণের কোন স্বত্ত্ব নেই। একচেটিয়া আধিপত্য বণিক শ্রেণী আর তাদের স্থানীয় ফড়িয়াবাজদের।

চলতি বছরের মধ্য এপ্রিলে হঠাৎ করেই খবর বের হয় নোয়াখালীর কয়েকটি এলাকার বোরো চাষীদের জমির ধান 'সাদা' চিটা হয়ে যাচ্ছে। দিকভ্রান্ত কৃষকরাও কূল করতে পারছেন না কেনো এমনটি হচ্ছে। হাইব্রিড ধান ঝলক আবাদকারী কৃষকদের জমিতেই এমনটি ঘটছে। কৃষকরা ছুটছেন বীজ বিক্রেতা- উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তার কাছে; এমনকি জেলা-উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়েও। কেউই বলতে পারছেন না কেনো এমনটি হচ্ছে। একটি সময় গণমাধ্যম কর্মীদের কাছেও বিষয়টি গুরুত্ব পায়। কৃষকের বিপর্যস্ত ফসলের মাঠ থেকে কৃষি অফিস পর্যন্ত ছুটোছুটির পর অবশেষে জানা যায় এক ধরণের বীজবাহিত রোগের কারণেই ঝলক ধান গাছে ধানের ছড়ার নিচে শুকিয়ে শেষতক সে ধান চিটা হয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন উঠলো, বীজেই যদি ভাইরাস থাকে তাহলে বিমান কিংবা স্থল বন্দরের কোয়ারেন্টাইন কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা নীরিক্ষা ছাড়া এ বীজ দেশে ঢুকলো কিভাবে। বীজের গুণাগুণ পরীক্ষা করে ছাড়পত্র দিলে তবেই সেটি দেশের বাজারে প্রবেশ এবং বাজারজাত করার সুযোগ তৈরি হয়, না হলে নয়। এমন মতামত প্রকাশিত হয় প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়। কিন্তু এসব কথাবার্তার কিছু গায়ে মাখেনি সরকার, বীজ প্রত্যায়ন এজেন্সি, বিএডিসি, কোয়ারেন্টাইন কর্তৃপক্ষ বা হাইব্রিড বীজের আমদানীকারক এনার্জিপ্যাক এগ্রো কোম্পানি। শেষতক সর্বস্ব হারানো কৃষকরা নোয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে ক্ষতিগ্রস্ত ধান পোড়ানো, মানববন্ধন, জেলা থেকে শুরু করে জাতীয় প্রেসকাবের সামনে মানববন্ধন, কৃষিমন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান করে। কৃষকদের এত্তসব চিৎকার-চেঁচামেচিতে শেষতক কৃষি বিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত ঝলক চাষীদের একটি তালিকা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

ততদিনে মাঠ থেকে বোরো কৃষকের গোলায় উঠে গেছে। কেবল ফাঁকা পড়ে আছে ঝলক চাষী কৃষকদের গোলা। কৃষকরা এ মহাবিপর্যয়ের জন্য বীজ কোম্পানির কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে। কৃষি নিয়ে কর্মরত সংগঠন এবং গণমাধ্যমকর্মীরা ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নিয়ে নিরিবিছিন্নভাবে বিভিন্ন সংলাপ চালিয়ে গেলেও সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোন সাড়া মেলেনি। সরকারের উপরি-লেবেলে কিছু চিঠি চালাচালির মধ্যেই চাপা পড়ে যায় কৃষকের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিষয়টি। এর ফাঁকে পর্দার আড়ালে এনার্জিপ্যাক এগ্রো কোম্পানি আমাদের খামার বাড়ির কর্তাব্যক্তি এবং সচিবালয়ের কৃষি মন্ত্রকের কর্তাদের 'ম্যানেজ' করতে সমর্থ হন! নোয়াখালীর সাত হাজারসহ সারাদেশে যেখানে লক্ষাধিক

ব্যবসা চালিয়ে আসছে। তাদের হাত ধরেই এ বছর 'ঝলক' নামে আরেকটি বীজ বাজারে আসে। নানান অর্জন থাকলেও একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়- আমরা হুজুগে বাঙালী। সেই হুজুগকে কাজে লাগিয়ে রমরমা ব্যবসার ফাঁদ পেতেছে বীজ কোম্পানিগুলো। এখানে সাধারণ কৃষক কিংবা জনগণের কোন স্বত্ত্ব নেই। একচেটিয়া আধিপত্য বণিক শ্রেণী আর তাদের স্থানীয় ফড়িয়াবাজদের।

চলতি বছরের মধ্য এপ্রিলে হঠাৎ করেই খবর বের হয় নোয়াখালীর কয়েকটি এলাকার বোরো চাষীদের জমির ধান 'সাদা' চিটা হয়ে যাচ্ছে। দিকভ্রান্ত কৃষকরাও কূল করতে পারছেন না কেনো এমনটি হচ্ছে। হাইব্রিড ধান ঝলক আবাদকারী কৃষকদের জমিতেই এমনটি ঘটছে। কৃষকরা ছুটছেন বীজ বিক্রেতা- উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তার কাছে; এমনকি জেলা-উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়েও। কেউই বলতে পারছেন না কেনো এমনটি হচ্ছে। একটি সময় গণমাধ্যম কর্মীদের কাছেও বিষয়টি গুরুত্ব পায়। কৃষকের বিপর্যস্ত ফসলের মাঠ থেকে কৃষি অফিস পর্যন্ত ছুটোছুটির পর অবশেষে জানা যায় এক ধরণের বীজবাহিত রোগের কারণেই ঝলক ধান গাছে ধানের ছড়ার নিচে শুকিয়ে শেষতক সে ধান চিটা হয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন উঠলো, বীজেই যদি ভাইরাস থাকে তাহলে বিমান কিংবা স্থল বন্দরের কোয়ারেন্টাইন কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা নীরিক্ষা ছাড়া এ বীজ দেশে ঢুকলো কিভাবে। বীজের গুণাগুণ পরীক্ষা করে ছাড়পত্র দিলে তবেই সেটি দেশের বাজারে প্রবেশ এবং বাজারজাত করার সুযোগ তৈরি হয়, না হলে নয়। এমন মতামত প্রকাশিত হয় প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়। কিন্তু এসব কথাবার্তার কিছু গায়ে মাখেনি সরকার, বীজ প্রত্যায়ন এজেন্সি, বিএডিসি, কোয়ারেন্টাইন কর্তৃপক্ষ বা হাইব্রিড বীজের আমদানীকারক এনার্জিপ্যাক এগ্রো কোম্পানি। শেষতক সর্বস্ব হারানো কৃষকরা নোয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে ক্ষতিগ্রস্ত ধান পোড়ানো, মানববন্ধন, জেলা থেকে শুরু করে জাতীয় প্রেসকাবের সামনে মানববন্ধন, কৃষিমন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান করে। কৃষকদের এত্তসব চিৎকার-চেঁচামেচিতে শেষতক কৃষি বিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত ঝলক চাষীদের একটি তালিকা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

ততদিনে মাঠ থেকে বোরো কৃষকের গোলায় উঠে গেছে। কেবল ফাঁকা পড়ে আছে ঝলক চাষী কৃষকদের গোলা। কৃষকরা এ মহাবিপর্যয়ের জন্য বীজ কোম্পানির কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে। কৃষি নিয়ে কর্মরত সংগঠন এবং গণমাধ্যমকর্মীরা ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নিয়ে নিরিবিছিন্নভাবে বিভিন্ন সংলাপ চালিয়ে গেলেও সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোন সাড়া মেলেনি। সরকারের উপরি-লেবেলে কিছু চিঠি চালাচালির মধ্যেই চাপা পড়ে যায় কৃষকের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিষয়টি। এর ফাঁকে পর্দার আড়ালে এনার্জিপ্যাক এগ্রো কোম্পানি আমাদের খামার বাড়ির কর্তাব্যক্তি এবং সচিবালয়ের কৃষি মন্ত্রকের কর্তাদের 'ম্যানেজ' করতে সমর্থ হন! নোয়াখালীর সাত হাজারসহ সারাদেশে যেখানে লক্ষাধিক

ব্যবসা চালিয়ে আসছে। তাদের হাত ধরেই এ বছর 'ঝলক' নামে আরেকটি বীজ বাজারে আসে। নানান অর্জন থাকলেও একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়- আমরা হুজুগে বাঙালী। সেই হুজুগকে কাজে লাগিয়ে রমরমা ব্যবসার ফাঁদ পেতেছে বীজ কোম্পানিগুলো। এখানে সাধারণ কৃষক কিংবা জনগণের কোন স্বত্ত্ব নেই। একচেটিয়া আধিপত্য বণিক শ্রেণী আর তাদের স্থানীয় ফড়িয়াবাজদের।

চলতি বছরের মধ্য এপ্রিলে হঠাৎ করেই খবর বের হয় নোয়াখালীর কয়েকটি এলাকার বোরো চাষীদের জমির ধান 'সাদা' চিটা হয়ে যাচ্ছে। দিকভ্রান্ত কৃষকরাও কূল করতে পারছেন না কেনো এমনটি হচ্ছে। হাইব্রিড ধান ঝলক আবাদকারী কৃষকদের জমিতেই এমনটি ঘটছে। কৃষকরা ছুটছেন বীজ বিক্রেতা- উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তার কাছে; এমনকি জেলা-উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়েও। কেউই বলতে পারছেন না কেনো এমনটি হচ্ছে। একটি সময় গণমাধ্যম কর্মীদের কাছেও বিষয়টি গুরুত্ব পায়। কৃষকের বিপর্যস্ত ফসলের মাঠ থেকে কৃষি অফিস পর্যন্ত ছুটোছুটির পর অবশেষে জানা যায় এক ধরণের বীজবাহিত রোগের কারণেই ঝলক ধান গাছে ধানের ছড়ার নিচে শুকিয়ে শেষতক সে ধান চিটা হয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন উঠলো, বীজেই যদি ভাইরাস থাকে তাহলে বিমান কিংবা স্থল বন্দরের কোয়ারেন্টাইন কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা নীরিক্ষা ছাড়া এ বীজ দেশে ঢুকলো কিভাবে। বীজের গুণাগুণ পরীক্ষা করে ছাড়পত্র দিলে তবেই সেটি দেশের বাজারে প্রবেশ এবং বাজারজাত করার সুযোগ তৈরি হয়, না হলে নয়। এমন মতামত প্রকাশিত হয় প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়। কিন্তু এসব কথাবার্তার কিছু গায়ে মাখেনি সরকার, বীজ প্রত্যায়ন এজেন্সি, বিএডিসি, কোয়ারেন্টাইন কর্তৃপক্ষ বা হাইব্রিড বীজের আমদানীকারক এনার্জিপ্যাক এগ্রো কোম্পানি। শেষতক সর্বস্ব হারানো কৃষকরা নোয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে ক্ষতিগ্রস্ত ধান পোড়ানো, মানববন্ধন, জেলা থেকে শুরু করে জাতীয় প্রেসকাবের সামনে মানববন্ধন, কৃষিমন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান করে। কৃষকদের এত্তসব চিৎকার-চেঁচামেচিতে শেষতক কৃষি বিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত ঝলক চাষীদের একটি তালিকা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

ততদিনে মাঠ থেকে বোরো কৃষকের গোলায় উঠে গেছে। কেবল ফাঁকা পড়ে আছে ঝলক চাষী কৃষকদের গোলা। কৃষকরা এ মহাবিপর্যয়ের জন্য বীজ কোম্পানির কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে। কৃষি নিয়ে কর্মরত সংগঠন এবং গণমাধ্যমকর্মীরা ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নিয়ে নিরিবিছিন্নভাবে বিভিন্ন সংলাপ চালিয়ে গেলেও সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোন সাড়া মেলেনি। সরকারের উপরি-লেবেলে কিছু চিঠি চালাচালির মধ্যেই চাপা পড়ে যায় কৃষকের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিষয়টি। এর ফাঁকে পর্দার আড়ালে এনার্জিপ্যাক এগ্রো কোম্পানি আমাদের খামার বাড়ির কর্তাব্যক্তি এবং সচিবালয়ের কৃষি মন্ত্রকের কর্তাদের 'ম্যানেজ' করতে সমর্থ হন! নোয়াখালীর সাত হাজারসহ সারাদেশে যেখানে লক্ষাধিক

কৃষক ঝলক আবাদ করে সর্বশান্ত হয়েছে সেখানে সারাদেশে মাত্র দুই হাজার কৃষককে ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে 'ঝুঁকি' নিয়ে আগামি বোরো মওসুমে ঝলকের প্রদর্শনী প্লট করে দেওয়ার ফরমান জারি করে খামার বাড়ির কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

কৃষি সম্প্রসারণের সরেজমিন উইং থেকে জারি করা ফরমানে গাজীপুর, বরিশাল, শেরপুর, নোয়াখালী, গোপালগঞ্জ এবং কিশোরগঞ্জ জেলার দুই হাজার কৃষককে দিয়ে ঝলকের প্রদর্শনী প্লট করাতে তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয় এ সকল জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালককে। কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী তারা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কাছে সে নির্দেশনাটি পাঠিয়ে দেন।

লেখার এক পর্যায়ে বলেছিলাম হুজুগে বাঙালীর মতো আমাদের কৃষকরা সরকারের উৎসাহে গোগ্রাসে হাইব্রিড গিলেছেও ঝলকের প্রদর্শনী প্লটের তালিকা চাওয়ার পর নোয়াখালীর কৃষকরা তাতে আর হুজুগে মেতে ওঠেনি। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তারা শত চেষ্টা করেও নোয়াখালীর কয়েকটি উপজেলায় একজন কৃষককেও প্রদর্শণী প্লট করার জন্য রাজী করাতে পারেনি। বরং কৃষকরা তাদের ঘৃণা ভরে প্রত্যাখান করেছে। কিন্তু প্রদর্শণী প্লট করার জন্য কৃষকদের রাজী করাতে 'কর্মকর্তা'দের মরিয়াভাব দেখে বারবার মনে হয়েছে কৃষকবান্ধব সরকার কি আসলেই কৃষকের স্বার্থ দেখছে নাকি বীজ কোম্পানির স্বার্থ দেখছে? ঝলকের প্রদর্শনী প্লটের পরিচর্চা, বীজসহ সবধরণের উপকরণ সরবরাহ করবে বীজ কোম্পানি এনার্জিপ্যাক। এ কাজের মাধ্যমে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করবে গেল মৌসুমেও তাদের বীজ ভালো ছিলো, আমাদের কৃষকের অনভিজ্ঞতা এবং আবহাওয়ার কারণে ঝলক ধানের বিপর্যয় হয়েছে। এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত ঝলক চাষীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া থেকে নিজেদের রক্ষার পথ পাবে বীজ কোম্পানি। একই সাথে নুতন করে ঝলক জাতের ধান বীজ বিপণন করতে অসুবিধা হবে না।

এতোকিছুর পরেও আমাদের কৃষি বিভাগের কোন নড়াচড়া নেই। তারা বীজ কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার্থেই সচেষ্ট। কৃষক আসলে করবে কি? বীজ কোম্পানিগুলো যেমন বীজের নিয়শ্চয়তা (ওয়ারেন্টি) দিচ্ছে না তেমনি সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশে শষ্য বীমাও চালু হয়নি। ফলে রাষ্ট্রের খোরাকি মিটানোর জন্য কৃষকেই মরতে হচ্ছে, এটি যেন কৃষকের দায়।

সবশেষে ঝলক চাষী কৃষকদের সালাম ও অভিবাদন। তারা প্রদর্শণী প্লট তৈরির নামে এনার্জিপ্যাক এগ্রো কোম্পানি এবং কৃষি বিভাগের প্রতারণামূলক প্রস্তাবনাটি প্রত্যাখান করার সাহস দেখিয়েছেন। কৃষকদের এই তেজ এবং অহংবোধই হোক আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পাথেয় ।

লেখক : সাপ্তাহিক চলমান নোয়াখালী'র সম্পাদক ও দৈনিক সমকালের নোয়াখালী প্রতিনিধি।

পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড
অ্যাকশান নেটওয়ার্ক- প্রান

csrl
গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের
জন্য প্রচারাভিযান- সিএসআরএল

এই প্রচারাভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক-প্রান
বাড়ি # ০৮ সড়ক # ৩০, হাউজিং এস্টেট, মাইজদী, নোয়াখালী।
ফোন : ০৩২১-৬১৯২০, ০১৯১৯ ২৩১ ৭২২
ইমেইল : info@pran-bd.org ওয়েবসাইট : www.pran-bd.org